# স্বশাসন কল্যাণ অর্থনীতি এবং স্বেচ্ছামৃত্যু
# ফলিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রেক্ষাপটে

# স্বশাসন কল্যাণ অর্থনীতি এবং স্বেচ্ছামৃত্যু ফলিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রেক্ষাপটে

ড. দীপক কুমার বড়ুয়া

ধর্মাধার স্মৃতি রক্ষা সমিতি
ও
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন
৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী,
কোলকাতা-৭০০০১৫

স্বশাসন কল্যাণ অর্থনীতি এবং স্বেচ্ছামৃত্যু
ফলিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রেক্ষাপটে

স্বত্বাধিকারী : প্রকাশ সংস্থা

প্রকাশকাল : জুলাই, ২০১১

প্রকাশক : সুজিত কুমার বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড)
কোলকাতা - ৭০০ ০১৫

মুদ্রক : নিউ গীতা প্রিন্টার্স
৫১, ঝামাপুকুর লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য : ৫০ টাকা

উভয় বঙ্গে বহুজন পূজিত পালি শাস্ত্রবিদ মহাপণ্ডিত
শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির-এর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

# মুখবন্ধ

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ১১১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মাধার স্মৃতি বক্তৃতামালার তৃতীয় বক্তৃতা প্রদান করতে আমাদের অনুরোধে সম্মত হওয়ার জন্য আমরা বিশিষ্ট বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ অধ্যাপক ড. দীপক কুমার বড়ুয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ। ড. বড়ুয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, নবনালন্দা মহাবিহারের প্রাক্তন পরিচালক এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক পালিভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য "সার্টিফিকেট অব অনার" দ্বারা স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তিনি বহু সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

"সুশাসন কল্যাণ অর্থনীতি এবং স্বেচ্ছামৃত্যুঃফলিত বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষাপটে" তেমনি আর একটি সারগর্ভ বক্তৃতা বা প্রবন্ধ রচনা করে অধ্যাপক দীপক কুমার বড়ুয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তাঁর মতে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মহাকারুনিক বুদ্ধ যেসব বাণী প্রদান করেছেন সেসব বাণীসমূহকে সামগ্রিকভাবে Applied Buddhism বা ফলিত বৌদ্ধধর্ম আখ্যা দেওয়া যায়। তারই প্রেক্ষাপটে তিনি বর্তমান বিশ্বের তিনটি মুখ্য আলোচ্য বিষয় : Good Governance বা সুশাসন, Welfare Economics বা কল্যাণ অর্থনীতি এবং Euthanasia বা স্বেচ্ছামৃত্যু সম্পর্কে বুদ্ধবাণীর প্রাসঙ্গিকতার উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর "ফলিত বৌদ্ধধর্ম" নামকরণ এবং মতামতের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি।

গ্রন্থের শুরুতে তিনি মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের জীবন, কর্ম ও গ্রন্থসমূহের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মূল্যায়ন করে মহাস্থবিরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন। বলা বাহুল্য, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ছিলেন সকল জনগণের বিশেষতঃ বাঙালি বৌদ্ধদের পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ মহাপুরুষ।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থটি বৃহত্তর বিদ্বৎ সমাজে সমাদৃত হবে।

কলকাতা ৭০০ ০১৫
২৭শে জুলাই ২০১১

**ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া**
*সভাপতি*
ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট
এবং
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

# নিবেদন

বক্তব্যের প্রারম্ভেই আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করি মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির-এর প্রতি। আনন্দের বিষয়, এই মহাপণ্ডিতের স্মৃতি সদা জাগ্রত রাখতে এবং এই মনীষীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বার্ষিক এই স্মারক বক্তৃতার ব্যবস্থা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির হলেন এমন এক পণ্ডিত যিনি কোন পরিস্থিতিতেই বিচলিত হন না, বায়ু দ্বারা অকম্পিত কঠিন পর্বতের ন্যায় নিন্দাপ্রশংসায় অবিচল থাকেন :

সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি,
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা—'ধর্ম্মপদ', পণ্ডিত-বর্গ্গ', গাথা ৬।

মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদান্তে আমি প্রীতি শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই কোলকাতাস্থ ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতির এবং নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন-এর মাননীয় সদস্য-সদস্যা এবং ঐ সংস্থাদ্বয়ের সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুজিত কুমার বড়ুয়া এবং বিশিষ্ট সদস্য শ্রদ্ধেয় সুমনপাল ভিক্ষু মহোদয়ের প্রতি আমাকে 'পণ্ডিত মহাস্থবির স্মারক বক্তৃতা'-র তৃতীয় বক্তারূপে নির্বাচন এবং আমার প্রিয় বিষয় সুশাসন কল্যাণ-অর্থনীতি এবং স্বেচ্ছামৃত্যু : ফলিত বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষাপটে' বা Good Governance Welfare Economics and Euthanasia : In the Perspective of Applied Buddhism-এর উপর আমার বক্তব্য রাখার অনুরোধের জন্য। ২০০৫ সালে সর্বপ্রথম ফলিত বৌদ্ধধর্ম বা Applied Buddhism-এর উপর আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন ভারত সরকার পরিচালিত বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে মানবকল্যাণে বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে। ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্মের আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা বিচার বিশ্লেষণ করে গবেষকবৃন্দ Green Buddhism বা 'হরিৎ বৌদ্ধধর্ম' অথবা Engaged Buddhism বা 'কর্মবদ্ধ বৌদ্ধধর্ম' ইত্যাদি নতুন নতুন কয়েকটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক অভিমুখগুলি বিবেচনা করে সেগুলি একটি প্রধান শিরোনাম, যথা Applied Buddhism বা 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' শীর্ষক এর অন্তর্গত করা যেতে পারে। যেমন, ফলিত অর্থনীতি, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত রসায়নশাস্ত্র, ফলিত মনোবিদ্যা, ফলিত রাশিবিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দবন্ধগুলি ব্যবহার করা হয়ে

থাকে। সেরকম 'আধ্যাত্মিক বৌদ্ধধর্ম' এর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস না করে এই ধর্মের ব্যবহারিক রীতি ব্যাখ্যা করতে 'বৌদ্ধধর্ম' শব্দের আদিতে 'ফলিত' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' শব্দযুগল পাওয়া যায়। আশা করা যায়, এই নতুন শব্দবন্ধটি ধীরে ধীরে বহুজনগ্রাহ্য হবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করেই 'পণ্ডিত ধর্মাধার তৃতীয় স্মারক বক্তৃতা ২০১১'-এর শিরোনাম রাখা হল 'সুশাসন কল্যাণ অর্থনীতি এবং স্বেচ্ছামৃত্যু : ফলিত বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষাপটে'। বিষয় নির্বাচনে অবশ্য বিশ্বব্যাপী বর্তমান বিপর্যস্ত শাসনব্যবস্থা, স্বার্থপর অর্থনীতি এবং অপ্রয়োজনীয় নীতিহীন মৃত্যু বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই তিনটি রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতির ও সামাজিক সমস্যা এবং তার প্রতিকারের জন্য বুদ্ধবচনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রোতা এবং পাঠকের নিকট এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হলে পরিশ্রম সার্থক হবে।

ড. দীপক কুমার বড়ুয়া

'শিলাবতী'
ব্লক-ইই, নম্বর-৮০/২এ
সল্টলেক সিটি, সেক্টর দুই
কোলকাতা-৭০০ ০৯১, পশ্চিমবঙ্গ ভারত
২৭ জুলাই ২০১১

# বিষয় বিন্যাস


মুখবন্ধ

নিবেদন

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্‌কথন

পালিবিদ্যাবিদ্ মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির

বৌদ্ধধর্ম-ফলিত বৌদ্ধধর্ম-পাঠ-সংকেত ❑ ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুশাসন

সংজ্ঞা—'সুশাসন'-এর পূর্ব শর্তাবলী—'সুশাসন'-এর অষ্ট অঙ্গ—পালি সাহিত্যে 'সুশাসন'—'অরিয় অটঠঙ্গিক মগ্গ' বা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'—'নিকায়' গ্রন্থে 'সুশাসন'—বৌদ্ধ প্রজাতন্ত্র এবং 'সুশাসন'—'ধর্মপদ' গ্রন্থে 'সুশাসন'—সম্রাট অশোক এবং 'সুশাসন'—জাপান-এর প্রথম সংবিধান এবং 'সুশাসন'—মন্তব্য—পাঠ-সংকেত ❑ ২১

তৃতীয় অধ্যায়

কল্যাণ অর্থনীতি

সংজ্ঞা—কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য—মানবজীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা—কল্যাণ অর্থনীতি এবং বৌদ্ধ শীল বা সদাচার পালন—কল্যাণ অর্থনীতি এবং 'মজ্জিম পটিপদা'—সম্পদ সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং ক্ষয় সাধন—কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ-মন্তব্য — পাঠ-সংকেত ❑ ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

স্বেচ্ছামৃত্যু

সংজ্ঞা—স্বেচ্ছামৃত্যুর প্রকারভেদ—পালি সাহিত্যে স্বেচ্ছামৃত্যু—স্বেচ্ছামৃত্যু বিষয়ে চীনা পরিব্রাজক হিয়েন সাঙ—স্বেচ্ছামৃত্যু এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান—স্বেচ্ছামৃত্যু বিভিন্ন দেশে—মন্তব্য—পাঠ-সংকেত ❑ ৪৮

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশেষ ❑ ৫৬

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ❑ ৫৮

ড. দীপক কুমার বড়ুয়া : জীবনপঞ্জী ❑ ৬০

প্রথম অধ্যায়

# প্রাক্‌কথন

পালিবিদ্যাবিদ্ মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির

ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের সুসন্তান, ত্রিপিটক বিশারদ, মহাপণ্ডিত, সর্বদর্শানাচার্য, তত্ত্বভূষণ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা বহুজন শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির জন্মগ্রহণ করেন ২৭ জুলাই ১৯০১ সোমবার বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থিত চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত ধর্মপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বাঙালী বৌদ্ধ পরিবারে পিতা হরচন্দ্র বড়ুয়া এবং মাতা প্রাণেশ্বরী দেবীর সন্তানরূপে। পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ২৬ জুন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রদ্ধেয় ধর্মকথিক মহাস্থবিরের নিকট শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে প্রবজ্যা গ্রহণের পর নিজেকে অধ্যয়ন এবং সমাজ কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করেন। চট্টগ্রামে অবস্থানকালীন শ্রদ্ধেয় ধর্মকথিক মহাস্থবির এবং বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের তত্ত্বাবধানে তিনি পালি ভাষা এবং সাহিত্য শিক্ষা ও অনুশীলন করতে থাকেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে পালি ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি সিংহল বা বর্তমান শ্রীলঙ্কা যাত্রা করেন এবং সেখানে কয়েক বছর অধ্যয়নের পর পালি 'ত্রিপিটক' বা 'তিপিটক' সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনান্তে তিনি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'মহামুনি পালি কলেজ'-এর অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। এই পালি কলেজে তিনি কয়েক বছর পালি ভাষা ও সাহিত্য এবং থেরবাদ বৌদ্ধদর্শন-এ অধ্যাপনা করেন। ইতিমধ্যে তিনি কলকাতা মহানগরীতে এসে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'বিনয়', 'সুত্ত' এবং 'অভিধম্ম-পিটক'-এর তিনটি উপাধি পরীক্ষায় ১৯৩৪, ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে 'ত্রিপিটক বিশারদ' উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার কলকাতাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে অবস্থিত 'নালন্দা বিদ্যাভবন'-এ উপাধ্যায় রূপে যোগদান করেন এবং দুবছরের মধ্যে তিনি নালন্দা বিদ্যাভবন-এর অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। ১৯৫৪ সালের মে থেকে ১৯৫৬ সালের মে মাস পর্যন্ত বার্মা, বর্তমান মায়ানমার-এ, রেঙ্গুন বা ইয়ানগুন শহরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সংগায়নের অধিবেশন-এ একজন 'সঙ্গীতিকারক' রূপে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে তিনি আংশিক সময়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ।

মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অধ্যাপনা এবং নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে পালি ভাষা ও সাহিত্যে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ৪ নভেম্বর ২০০০ তাঁর মহাপ্রয়ানে সংখ্যাতীত ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ গবেষক এবং গুণগ্রাহী এক মহান পণ্ডিতের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। কিন্তু তাঁর রচিত নিবন্ধাবলী এবং গ্রন্থসমূহের মধ্যে তিনি চির অম্লান রয়েছেন। পালিবিদ্যা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় প্রথাগত পালি

'তিপিটক' বা 'ত্রিপিটক' নিরন্তর অনুশীলন এবং সত্যনিষ্ঠ অনুবাদকর্মের মধ্যে। বস্তুতঃ মূল পালিভাষা থেকে বাংলা ভাষায় তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলি পালি সাহিত্যে এবং বৌদ্ধ ধর্মে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করছে।

শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবিরকৃত পালি সাহিত্যের বহুল প্রচারিত 'খুদ্দক-নিকায়ন্তর্গত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধম্মপদ' যার তিনটি বাংলা সংস্করণ ১৯৫৪, ১৯৬৬, ১৯৯১ প্রকাশিত হয়। পালি 'ধম্মপদ' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ তিনটি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল। পাঠকের সুবিধার্থে এই তিনটি অনুবাদ গ্রন্থ-এর পকেট সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।[১] এই গ্রন্থটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। বাংলা ভাষায় এই অনুবাদকর্মের ভাষা সাবলীল ও সহজবোধ্য। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন এই গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "ধর্মাঙ্কুর বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির সম্পাদক ধম্মপদের সুলভ ও সুবহ সংস্করণটি সাদরে অভিনন্দিত হবার যোগ্য। বাংলা ভাষায় ধম্মপদের এমন সুপরিণামটি ও স্বল্পায়তন সংস্করণ আর আছে কিনা জানি না। মূল পালি পাঠের সঙ্গে বিতর্ক ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্য বর্জিত সহজ সরল অথচ মূলানুগ অনুবাদ থাকাতে বইখানি পণ্ডিত অপণ্ডিত নির্বিশেষে সব রকম আগ্রহী পাঠকেরই নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপাঠ্য হবার উপযোগী হয়েছে। প্রয়োজনমতো স্থলে স্থলে ভারতীয় সাহিত্য থেকে সানুবাদ সদৃশ উক্তি উদ্ধৃত করাতে এবং পরিশেষে দুরুহ শব্দের অর্থ দেওয়াতে বই খানির উপযোগিতা বহু পরিমাণে বেড়েছে।

এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের ফলে শ্লোকগুলির অর্থ গ্রহণ ও তাৎপর্য উপলব্ধির পক্ষে পাঠকের খুবই সহায়তা হবে"।[২] বস্তুতঃ বুদ্ধ বচনের সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ হল 'ধম্মপদ'। এই অনুবাদগ্রন্থে মূল গাথাগুলির সহজ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরিশিষ্টরূপে দুর্জ্ঞেয় শব্দগুলি সহজবোধ্য করা হয়েছে।

বুদ্ধবচন সংগ্রহের 'সুত্তপিটক' পাঁচটি 'নিকায়' বা সংকলন-এ বিভক্ত। এই পিটক-এর দ্বিতীয় সংকলনটি হল 'মজ্ঝিমম-নিকায়' বা মধ্যম নিকায়' যার তিনটি খণ্ডের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডটি মূল পালি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির। এই অনুবাদ গ্রন্থে সন্নিবেশিত 'সুত্ত'সমূহের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 'মুখবন্ধ'-এ অনুবাদক সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন : "বিবিধ মতবাদের হেতু নিকায় গ্রন্থসমূহের মধ্যে ইহার (মজিঝম-নিকায়ের) গুরুত্ব সমধিক। বহুস্থলে শাস্ত্রান্তরের সহিত তুলনা করিয়া ইহাতে প্রকৃষ্টরূপে স্বমত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় উল্লেখান্তে 'মুখবন্ধ'-এ সংক্ষেপে আলোচ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে : ১। অহিংসা ও আমিষাহার; ২। অব্যাকৃত, ৩। বুদ্ধবচন, ৪। অপৌরুষেয়বাদ খণ্ডন, ৫। সর্বজ্ঞ তার স্বরূপ এবং ৬। জাতিভেদের অনর্থ। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ড. নলিনাক্ষ দত্ত। 'ভূমিকা'য় তিনি সংক্ষেপে পালি সাহিত্যে 'মজিঝম-নিকায়' গ্রন্থের গুরুত্ব, অবৌদ্ধ ধর্মমত, (জৈন ধর্মমত,

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম), বৌদ্ধধর্ম ও সাধনার মার্গ— ১। ব্রহ্মচর্য পালন বা সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন, ২। ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ, ৩। ইন্দ্রিয় সংযম, ৪। চৈতসিক ক্লেশ ও উপক্লেশাদি বর্জন, ৫। নির্বাণ-মার্গের উচ্চতর সাধনা, ৬। ধ্যান ও সমাধি, ৭। স্মৃত্যুপস্থান, ৮। ব্রহ্মবিহার—দুই রকম সাধনায় পথে ক্রমোন্নতির স্তর, নির্বাণ। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন : "অনুবাদক মহাস্থবির ধর্মাধার ভিক্ষু এই অমূল্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া দেশের ও দশের বহু উপকার সাধন করিলেন এবং নিজেরও সাধনায় এক স্তর উপরে উঠিলেন।"[৩]

মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের জন্য একটি অনবদ্য অনুবাদকর্ম হল : 'সাসনবংস' বা 'শাসনবংশ' যেটি বর্তমান মায়ানমার-এ ১৮৬১ সালে মান্দালয়ের সঙ্ঘরাজ বিহারের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্থবির পঞ্ঞাসামী (প্রজ্ঞাস্বামী) রচনা করেন। বঙ্গভাষায় অনূদিত ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসাশ্রয়ী এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। 'সাসনবংস'-এর বিষয়বস্তু হল বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের ইতিহাস। মূলতঃ ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বর্ননার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে বৌদ্ধধর্ম-এর ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এই আধুনিক পালি গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির একজন বিদগ্ধ জ্ঞানীর ন্যায় পরম মমতাভরে এই গ্রন্থটি সাবলীল ভঙ্গীতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদকর্মে মহাস্থবিরের পালি ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস সম্বলিত 'সাসনবংস'-এর বর্তমান বঙ্গানুবাদটি করে বাঙালী পাঠকদের মহা উপকার সাধন করেছেন শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির।

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন হিন্দী ভাষায় 'দর্শন-দিগদর্শন' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেরই একটি অংশ শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির বাঙালী পাঠকের সুবিধার্থে 'বৌদ্ধদর্শন' নামে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি যদিও হিন্দী থেকে অনূদিত, তবুও এতে অনুবাদকের পালি ভাষা ও সাহিত্য-এ গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিকশিত হয়েছে। 'মুখবন্ধ'-এ তিনি স্বীকার করেছেন : "এতদিন আমরা থেরবাদ পালি সাহিত্যের চর্চা করিয়া আসিয়াছি। মহাযান বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ হয় নাই। বিশেষতঃ পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থাবলী আজ পর্য্যন্ত ভারতে সুলভ নহে...এই গ্রন্থে অনুবাদকের অযোগ্যতা স্থানে স্থানে প্রকট হইয়াছে...এই গ্রন্থ যদি বাঙালী পাঠক সমাজকে বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্র অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করিতে সক্ষম হয়, তবেই ইহার প্রকল্প সার্থক মনে হইবে।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় মন্তব্য করেছেন : "শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির রাহুলজীর এই গ্রন্থখানিকে শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত অনুবাদ করিয়াছেন...ধর্মাধার মহাস্থবির গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব মূল্যানুসরণ করিয়া অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ফলে মূলের দুর্বোধ্যতা হয়ত স্থানে স্থানে অনুবাদেও বর্তাইয়াছে।"[৪] এই অনূদিত 'বৌদ্ধ দর্শন'-এ চারটি অধ্যায় রয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষণ করলে অনুবাদকের

পালি ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করা যায়। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে : (১) গৌতম বুদ্ধ—সংক্ষিপ্ত জীবনী, (২) সাধারণ বিচার—চারি আর্য সত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিমার্গ, (৪) দুঃখনিরোধ—মার্গের অন্তরায়, (৫) দার্শনিক বিচার, (৬) বিচারস্বাতন্ত্র্য, (৭) সর্ব্বজ্ঞতা নহে, এবং (৮) বৌদ্ধ দর্শন ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থা। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে : (১) নাগসেন—সামাজিক পরিস্থিতি, গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের সম্মিলন, (২) নাগসেনের জীবনী, (৩) দার্শনিক বিচার—অনাত্মবাদ, কর্ম্ম ও পুনর্জ্জন্ম, নাম ও রূপ নির্বাণ।

পালি পিটকোত্তর গ্রন্থ 'মিলিন্দ পঞ্ঞ' বা 'মিলিন্দ প্রশ্ন'-এর বঙ্গানুবাদের 'মুখবন্ধ'-এ অনুবাদক শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার মহাস্থবির জানিয়েছেন : "কেবলমাত্র একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যাঁহারা প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বের পুস্তক-ভাণ্ডার হইতে 'মিলিন্দ প্রশ্ন' (মিলিন্দ পঞ্ঞ') অধ্যয়ন ব্যতীত অপর কোন উপাদেয় গ্রন্থ নাই।...এই গ্রন্থখানি ছয় পরিচ্ছেদে এবং বাইশ বর্গে বিভক্ত। ইহাতে সন্নিবেশিত প্রশ্ন ২৬২টি আর অনাগত প্রশ্ন ৪২টি, সর্বসাকুল্যে ইহাতে ৩০৪টি প্রশ্নের সমাহার ও সমাধান রহিয়াছে। এই পুস্তক বৌদ্ধদেশসমূহে স্থানীয় ভাষায় মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।...বাংলাভাষায় পূর্বের অনুবাদগুলি এখন সহজলভ্য নহে। তজ্জন্য আমি ১৯৫৮ অব্দে ইহার অনুবাদ আরম্ভ করি। স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করিবার জন্য অনুবাদ ব্যাখ্যানুসারে করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকৃত অর্থোদ্ধার হইয়াছে কিনা তাহা সুধীবর্গের বিবেচ্য"। বাংলা ভাষায় এই অনূদিত গ্রন্থটি সম্পর্কে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের 'ভূমিকা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রী ভট্টাচার্য লিখেছেন : "অত্যন্ত আনন্দের কথা যে বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয় বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কেবলমাত্র বঙ্গভাষাভাষী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই যে উপকৃত হইবেন তাহা নহে, প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁহাদেরই উৎসুক্য আছে, এইরূপ সকল বঙ্গবাসীই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন, এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি রাজপথ ইহার দ্বারা তাঁহাদের নিকট উন্মুক্ত হইবে...এই জাতীয় একখানি গ্রন্থের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রণয়নের দ্বারা মহাস্থবির ধর্মাধার অধ্যাত্মরসপিপাসু বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন...আমি শ্রদ্ধেয় মহাস্থবিরকে তাঁহার এই সার্থক প্রচেষ্টার জন্য আমার আন্তরিক সাধুবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি...।"[৫] বাস্তবিকই শ্রদ্ধেয় ধর্মাধার কৃত বঙ্গানুবাদ 'মিলিন্দ প্রশ্ন' পালি তথা বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে চলেছে।

এছাড়া নিম্নোক্ত রচনাগুলি মহাপণ্ডিত, ধর্মাধার মহাস্থবিরের পালিভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে : (ক) 'অধিমাস বিনিশ্চয়'—এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে বুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ করে পাঁচ হাজার বছরের অধিমাস বর্ষপঞ্জী লভ্য, (খ) 'বর্ষাবাস

বিভ্রাট'—ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস সম্বন্ধীয় সমস্যার যুক্তিসংগত কারণসহ আড়াই হাজার বছরের বর্ষাবাসপঞ্জী এই গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে এবং (গ) 'বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন'—মুখ্যতঃ পালি 'তিপিটক' বা 'ত্রিপিটক'-এ বর্ণিত বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান এবং অখণ্ড ভারতে বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে।

উপরোক্ত আলোচনায় মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির-এর পালি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা প্রতিফলিত হয়েছে। 'ত্রিপিটকবিশারদ' উপাধি লাভ করে তিনি তাঁর কর্মে ও সাধনার দ্বারা এই উপাধির একজন যোগ্যতম ব্যক্তিরূপে নিজেকে প্রতিভাত করেছেন। একজন তথ্যনিষ্ঠ গবেষকের দৃষ্টিতে তিনি পালি সাহিত্যের বিশেষ করে 'অভিধম্ম' সাহিত্যের জটিল বিষয়গুলি সহজ সরল ব্যাখ্যা করে তিনি বাঙালী তথা ভারতীয়দের অশেষ উপকার সাধন করেছেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর অনুবাদ কর্ম ও পালি সাহিত্যাশ্রিত গ্রন্থাবলী এবং এক বিরাট সংখ্যক নিবন্ধাবলী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর পালি ভাষা ও সাহিত্য অনুরাগীদের সততঃ অনুপ্রাণিত করবে, উৎসাহিত করবে। পালি সাহিত্যে অমূল্য অবদানের জন্য ভারতের মহামহিম রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর সম্মাননা সমগ্র পালি সাহিত্যপ্রেমীদের গৌরবান্বিত করেছে। মহাপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির যথার্থই একজন দরদী পালিবিদ্যা বিশারদ বা পালিবিদ্যা কোবিদ।

## বৌদ্ধধর্ম

সুপ্রচলিত 'বৌদ্ধধর্ম' শব্দবন্ধের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। গৌতম বুদ্ধের জীবন এবং উপদেশাবলী অথবা পালি, সংস্কৃত বৌদ্ধ, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত সাহিত্যে উপলব্ধ তথাগতের উপদেশাবলীতে প্রতিফলিত জীবনদর্শনই হল 'বৌদ্ধধর্ম'। তাঁর শিষ্য-শিষ্যা অর্থাৎ ভিক্ষু-ভিক্ষুনী এবং উপাসক উপাসিকাবৃন্দের উদ্দেশ্যে গৌতম বুদ্ধ ধর্ম-দেশনা দিয়েছিলেন। এই সকল ধর্ম-দেশনা মোটামুটি দু'শ্রেণীর শ্রোতৃবর্গের প্রতি নির্দিষ্ট করেছিলেন। এক শ্রেণীর শ্রোতা ছিলেন যাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর এবং মানসিক দিক থেকে অনেক উন্নত। সুতরাং এই তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি উদ্দেশিত হয়েছিল গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত তাঁর দার্শনিক বক্তব্যগুলি যেমন পচ্চয় বা প্রত্যয়-কথা, পটিচ্চসমুপ্পাদ বা প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, চিত্ত চৈসিক ও রূপ বিবরণ, নিব্বাণ বা নির্বাণ প্রসঙ্গ প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বচনসমূহ। আরেক শ্রেণীর শ্রোতা যাঁদের মেধা মধ্যম মানের তাঁদের জন্য অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তিনি চারি আর্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, মধ্যম পন্থা ইত্যাদি অর্ধ-দার্শনিক ও লৌকিক বিষয়গুলির দেশনা তিনি দিয়েছিলেন। অবশ্য উপরোক্ত বুদ্ধবচনগুলি যখন প্রথমোক্ত শ্রেণীর শ্রোতাদের প্রতি উদ্দিষ্ট হয় তখন সেগুলির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিশদ করা হয়েছে। বুদ্ধবচনসংগ্রহ 'সুত্ত-পিটক'-এ গৌতম বুদ্ধ বা সমসাময়িক তাঁর শিষ্যদের বক্তব্যসমূহ সংগৃহীত হয়। এগুলি সাধারণতঃ জনগণের উদ্দেশ্যে

কথিত হয়। সেজন্য এই সকল উপদেশাবলী একেবারে সরাসরি এবং জনভাষায় প্রচলিত। কিন্তু ঐ সংগ্রহের তৃতীয় সংগ্রহ যেটি 'অতিধম্ম' নামে সুপরিচিত সেটিতে বৌদ্ধ দর্শন ও মনস্তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে। সুতরাং এই সংগ্রহটি কেবলমাত্র প্রাজ্ঞ এবং উন্নততম মানসিক স্তরের বুদ্ধশিষ্য-শিষ্যাদের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট হয়েছে। এমনকি চারি আর্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, মধ্যম পন্থার ন্যায় আপাত সহজবোধগম্য বিষয়গুলি যখন 'অভিধম্ম-পিটক'-এ সংকলিত হয়েছে সেগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলে এর ব্যাখ্যাগুলি আর সাধারণ মেধার ব্যক্তিদের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে পড়ে না। অন্যদিকে প্রথম বুদ্ধোপদেশসংগ্রহ 'বিনয়-পিটক'-এ কেবলমাত্র ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের অবশ্য পালনীয় বিধিসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এই 'পিটক' সংগ্রহ প্রয়োজনীয় কর্তব্য-অকর্তব্যগুলি বিধিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং তিনটি 'পিটক' সংগ্রহ অর্থাৎ 'বিনয়-পিটক', 'সুত্ত-পিটক' এবং 'অভিধম্ম-পিটক'-এ যে বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে এই তিনটি 'পিটক' বা 'তিপিটক' বা ত্রিপিটক'-এ বুদ্ধের যে অমূল্য এবং সার্বজনীন উপদেশাবলী রয়েছে এবং তিনটি 'পিটক'-এর অট্ঠকথা' বা অর্থকথা বা ভাষ্যসমূহে যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেগুলির উপর একান্ত নির্ভরশীল 'বৌদ্ধধর্ম' যা আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পৃক্ত। এক কথায়, বুদ্ধবচন-এর প্রকৃত স্বরূপ এবং তার যথাযথ ব্যাখ্যান বা অর্থপ্রকাশ-এর মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের যথার্থ প্রকৃতি বা স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব। গৌতম বুদ্ধ দেশিত ধর্ম বা নীতি হল 'বৌদ্ধধর্ম'।

**ফলিত বৌদ্ধধর্ম**

গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলী যেগুলি পূর্বে উল্লিখিত চারটি ভারতীয় ভাষায় উপলব্ধ হয়, সেগুলি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক এবং ফলিত—এই দুই শ্রেণীতে বিভাজিত করা যায়। অবশ্য বৃহত্তর অর্থে বুদ্ধের সব উপদেশই আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক। কিন্তু এই সকল আধ্যাত্মিক বা নৈতিক উপদেশগুলিতে প্রসঙ্গক্রমে এমন সব বিষয় তিনি উত্থাপন বা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করেছেন যেগুলি মানবিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং পার্থিব বিষয় ও সমস্যা সংশ্লিষ্ট শ্রোতৃবর্গকে প্রধানতঃ নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে সমসাময়িক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। তাঁর উপদেশসমূহ নৈতিক আবরণে একান্তই ধর্মীয় হলেও এগুলিকে জনগণের মঙ্গল কামনায় একটি পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। এই সকল একান্তই নীতি নির্ভর ধর্মীয় উপদেশগুলিকে পাঠকের সুবিধার্থে 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর ফলে বহুল প্রচারিত 'বৌদ্ধধর্ম' শব্দবন্ধ-এর গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস হবে না। অন্যত্রঃ 'বৌদ্ধধর্ম' শব্দবন্ধ-এর পূর্বে 'ফলিত' বা 'প্রায়োগিক' শব্দের প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত এবং বিসদৃশ মনে হলেও তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রযুক্তিবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে মানবজীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের সঙ্গে

সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম-এর সংজ্ঞা মানবজাতির প্রয়োজনে ক্রমশঃ বিস্তারিত হয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মীয় গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস না করে 'বৌদ্ধধর্ম'-এর নিরন্তর নব মূল্যায়নের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের কতিপয় পণ্ডিত নিজেদের গবেষণায় সর্বদা নিয়োজিত রেখেছেন বুদ্ধের ধর্ম দ্বারা মানবজীবনের বর্তমান পার্থিব বিষয়সমূহ অবগত হয়ে সমস্যাবলী সমাধান করতে। শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রসারে এবং ক্রমপরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানবজাতি ক্রমাগত নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন, যথা, সুশাসন, কল্যাণ বা কল্যাণকর বা মঙ্গলকর অর্থনীতি, স্বেচ্ছামৃত্যু, অহিংসা ও শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি, মানবিক অধিকার ও নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি স্থাপন, পরিবেশ প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি আধুনিক বিষয়সমূহ। মানবের আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের উপদেশের মাধ্যমে এই সকল আধুনিক বিষয়সমূহ সম্মুখীন হতে হয়। আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় আবেদনের মধ্যে এই সকল মানবিক বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা যেতে পারে 'ফলিত বৌদ্ধ ধর্ম' অথবা Applied Buddhism-র প্রেক্ষাপটে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' শব্দবন্ধটি সুপ্রচলিত না হলেও একেবারে অযৌক্তিক নয়। এর দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম-এর প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্ট হয়েছে। বর্তমান কালে এই ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করতে গবেষকবৃন্দ ইতিমধ্যে Green Buddhism বা 'হরিৎ বৌদ্ধধর্ম', Engaged Buddhism বা কর্মবদ্ধ বা 'কর্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ' বা 'কর্মপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ বৌদ্ধধর্ম', Socially Engaged Buddhism বা 'সামাজিক দায়বদ্ধ বৌদ্ধধর্ম' ইত্যাদি অভিব্যক্তি ব্যবহার করেছেন। এগুলি দ্বারা বৌদ্ধধর্মের এক একটি প্রেক্ষিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক কিংবা ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ব্যতীত সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধধর্ম-এর ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিকগুলি নির্দেশ করতে 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' শব্দবন্ধটি সুপ্রযুক্ত। এর দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রায়োগিক বিভিন্ন অভিমুখ সুস্পষ্ট। সেজন্য, পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, বিশ্বে গবেষকবৃন্দ বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের 'ত্রিপিটক' অথবা 'তিপিটক' এবং বিনয়সংক্রান্ত ভিক্ষু/ভিক্ষুণীদের অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলীর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস না করেও বৌদ্ধধর্মের বাস্তব এবং প্রায়োগিক দিকটির উপর নির্ভর করে অধুনা গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারণ করে মূল জীবকোষ, কৃত্রিম মানবদেহ সৃষ্টি, বাস্তুসংস্থান ও সুস্থ পরিবেশ, বিশ্বশান্তি ও অহিংসা, সুশাসন, মানবাধিকার ও নৈতিক মূল্যবোধ, কল্যাণকর বা মঙ্গলকর অর্থনীতি, স্বেচ্ছামৃত্যু প্রভৃতি নিত্য নতুন বিষয়ের আলোকে বুদ্ধের উপদেশ বা বৌদ্ধধর্মের নব মূল্যায়ন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। আধুনিক সমস্যা এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্মের প্রায়োগিক বিষয়গুলির অন্বেষণের ফলে বাস্তবক্ষেত্রে 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' বা 'অ্যাপ্লায়েড বুদ্ধিজম' হল সেই বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধোপদেশ যা মানব জীবনের বর্তমান সমস্যাগুলি সমাধান করতে সাহায্য করে। বৌদ্ধধর্ম-এর এরকম প্রায়োগিক প্রসঙ্গগুলি আধুনিক নরনারীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে এবং ফলে এই ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

যেমন, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, মনোবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়কে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করার ফলে নতুন নতুন শিক্ষা বিষয়, যথা ফলিত পদার্থ বিদ্যা, ফলিত রসায়নবিদ্যা, ফলিত গণিতশাস্ত্র ও ফলিত মনোবিদ্যার আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনই মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বুদ্ধোপদেশ-এর প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' শীর্ষক বিষয়ের। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান-এ অভাবনীয় অগ্রগতি ও রাজনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন, জনবিস্ফোরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ও প্রাকৃতিক মানবিক জলীয় সম্পদ অপচয়-এর ফলে প্রতিদিন পৃথিবীতে মানব জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে এবং সেই সঙ্গে স্বতই অনুভূত হচ্ছে ফলিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োজনীয়তা। উপরোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতি এবং সমস্যাবলী স্পষ্ট করতে একমাত্র ফলিত বৌদ্ধধর্মই সক্ষম।

সুতরাং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৌদ্ধধর্ম যেমনই মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র সহায়ক, তেমনি মানব জীবনের পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করতে এবং সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করতে ফলিত বৌদ্ধ ধর্ম-এর কোন বিকল্প নেই। বস্তুতঃ এই দুই প্রকার— আধ্যাত্মিক এবং ফলিত বা প্রয়োগিক-বৌদ্ধ ধর্ম মানব জীবনকে সুখী এবং সৎ করতে পারবে। এই দুই বৌদ্ধ ধর্মে কোন বিরোধ নেই, বরঞ্চ একটি আরেকটির পরিপূরক। আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যক্তি পার্থিক জীবনের সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারেন। আধ্যাত্মিক বৌদ্ধধর্ম যেমন কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য, তেমন ফলিত বৌদ্ধধর্ম একান্ত প্রয়োজনীয় পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দের কারণে।

### পাঠ-সংকেত


১। **Pandit Dharmadhar Mahasthavir : A Ninetieth Anniversary Tribute.** Calcutta, His Holiness Sangharaj Dharmadhar Mahasthavir 90th Birth Anniversary Committee, 1991 (Barua, Dipak Kumar. **A Comparative Study of the Three Editions of the Pali Dharmmapada rendered into Bengali** by Venerable Dharmadhar Mahasthavir)

২। মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, অনু. 'ধম্মপদঃ মূল ও বঙ্গানুবাদ'। কলিকাতা, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১৯৫৪, পৃঃ আট-নয়।

৩। মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, অনু. 'মধ্যম নিকায় (দ্বিতীয় ভাগ)'। কলিকাতা, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, ১৯৫৬, পৃঃ ৮।

৪। মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, অনু. 'বৌদ্ধ দর্শন (অনুবাদ)।' কলিকাতা, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, ১৩৬৩ সন-১৯৫৬ সাল।

৫। মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, অনু. 'মিলিন্দ প্রশ্ন (বঙ্গানুবাদ)'। কলিকাতা, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃঃ ৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

# সুশাসন

সংজ্ঞা :

'শাসন'-এর সাধারণ অর্থ হলো 'পরিচালনা', 'পরিচালনা-ব্যবস্থা'। আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায় 'শাসন'-এর অর্থ হলো কোন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কতোগুলি আইনসঙ্গত বিধির দ্বারা দুই পক্ষের বিবাদ মীমাংসান্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। Governance অর্থাৎ 'শাসন' শব্দটির উৎস হলো গ্রীক-ল্যাটিন। Governance শব্দের অর্থ হলো 'পরিচালনা' অথবা 'শাসন', যে ব্যবস্থার দ্বারা সমাজ এবং জাতি চালিত বা শাসিত হয়। World Bank-এর সংজ্ঞা অনুসারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কার্যকরী করা এবং প্রতিষ্ঠানগত সঙ্গতির ব্যবহার দ্বারা সমাজের সমস্যা এবং বিষয়াবলী বিধিবদ্ধ করা। সচরাচর 'শাসন' এবং 'শাসক' বা 'সরকার' সমার্থক বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে শব্দদ্বয় সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে। 'শাসন' শব্দের অর্থ হলো 'অগ্রগতির পথ বা প্রণালী বা প্রক্রিয়াসমূহ' এবং 'নিয়মাবদ্ধ প্রণালীসমূহ' যেগুলির দ্বারা সমাজ, জাতি, পৃথিবী চালিত হয়; অন্যদিকে 'সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয় এই সকল অগ্রগমনের নিয়মাবদ্ধ প্রণালীসমূহকে বাস্তবায়িত বা রূপায়িত করতে। বস্তুতঃ 'সরকার' হলো শাসনব্যবস্থা বা নিয়মাবদ্ধ প্রণালীসমূহ কার্যকরী করার মুখ্য ব্যবস্থাপক।

অতএব 'সুশাসন' বা Good Governance হচ্ছে সৎ ন্যায়নীতিনির্ভর কল্যাণকর এক শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্র নির্ভর সর্বজনহিতকর কল্যাণ রাষ্ট্র বা Welfare State-এ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত। সুশাসনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে শাসক বা শাসকশ্রেণীরা। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জনগণের বা 'শাসিত'দের মধ্যে সুশাসন প্রবর্তন করা। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ সুশাসন-এর প্রয়োগ দেখা যায়। সুশাসন শব্দবন্ধটি দুটি শব্দের মিলিত রূপ—'সু' অর্থ 'ভালো', 'মঙ্গলময়', বা 'সুন্দর' এবং 'শাসন' হলো 'অনুশাসন', 'বিধি', 'নিয়মন' বা 'পরিচালন'। অথবা 'শুভ', 'সুশীল', 'সৎ' বা 'পরিচ্ছন্ন' শাসনব্যবস্থা যা বর্তমান কল্যাণকামী রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ। সংক্ষেপে 'সুশাসন' বলতে 'রাষ্ট্রীয় সুন্দর এবং মঙ্গলময় পরিচালন ব্যবস্থা'-কে বুঝায়। এর তিনটি অংশ হলো—(১) রাষ্ট্র, (২) শাসক বা রাজা শাসকশ্রেণী, (৩) জনসাধারণ বা জনগণ বা 'শাসিতবর্গ'। জনগণকে 'শাসন' বা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রনায়ক বা শাসক বা শাসকশ্রেণী 'সুশাসন'-এর সাহায্য গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞান অনুসারে 'সুশাসন'-এর বিপরীত হলো 'অপশাসন', 'কুশাসন' অথবা 'দুঃশাসন। রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ন্যায়নীতিনির্ভর বিধিবদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠা করা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় বসবাসকারী নাগরিক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর। বস্তুতঃ কল্যাণকর রাষ্ট্রের লক্ষ্যই হলো এই রাষ্ট্রসীমায় অবস্থানরত সকল অধিবাসীদের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ন্যূনতম পরিষেবার ব্যবস্থা করা।

## 'সুশাসন'-এর পূর্ব সর্তাবলী

'সুশাসন' প্রবর্তন এবং রক্ষাকল্পে শাসক কিংবা শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে নিম্নোক্ত কয়েকটি পূর্ব শর্ত পালন করা প্রয়োজন :

১। কুশল চিত্ত বা সুমন। সুচিন্তার দ্বারা নাগরিক বা প্রজাদের কল্যাণ সাধনের মনোবৃত্তি বা চৈতসিক।

২। উদারতা। উদার হৃদয় দ্বারা রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মঙ্গল চিন্তা।

৩। সুকর্ম। কুশল কর্মের দ্বারা অধিবাসীদের প্রকৃত সদর্থক মঙ্গল সাধন।

৪। স্বচ্ছতা বা Transparency। শাসকের মন বা চিত্ত এবং কর্ম স্বচ্ছ থাকা প্রয়োজন যাতে 'শাসিত'দের বিন্দুমাত্র সংশয় উৎপন্ন না হয় শাসকের বা সরকারের চিন্তাভাবনা ও কর্ম সম্বন্ধে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা রক্ষা করা প্রত্যেক গণতন্ত্রকামী শাসককূলের পক্ষে একান্ত কাম্য।

৫। নিরপেক্ষতা। শাসক বা সরকার-এর কর্মপদ্ধতির রূপায়ন সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বজায় রাখা অথবা নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপন রক্ষা করা। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

৬। সমদর্শিতা বা সমদৃষ্টি বা Equality। এটি নিরপেক্ষতাসূচক হলেও আরো ব্যাপক অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়। শাসককে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের দ্বারা সকল নাগরিককে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার আবশ্যক। দৈনন্দিন প্রশাসনিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে সমদর্শিতা প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন।

৭। উন্নয়নশীলতা। রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নই শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

৮। ভীতিমুক্ত পরিবেশ। রাষ্ট্রীয় কিংবা বিরোধী পক্ষের সন্ত্রাস পরিহার ও প্রতিরোধ করে ভয়শূন্য এক পরিবেশ সৃষ্টি কিংবা রক্ষা করা আবশ্যিক কর্তব্য শাসককূলের।

৯। নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধ। শীল বা নীতিধর্ম পালনের দ্বারা শাসকশ্রেণীর উচিৎ সকল নাগরিকের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা।

১০। বঞ্চনা লাঞ্ছনা ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের মানসিকতা। এরকম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকশ্রেণীর প্রয়োজন অপ্রমত্ততা বা সদা সতর্ক দৃষ্টির।

১১। অপপ্রচার এবং কুৎসা পরিহার। সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য যে কোন প্রচার ও কুৎসা পরিহার করা শাসকশ্রেণীর পক্ষে আবশ্যিক শর্ত।

১২। পরিচ্ছন্ন প্রশাসন। শাসকশ্রেণীকে পরিচ্ছন্ন প্রশাসন-এর দ্বারা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩। সুস্থ কর্মসংস্কৃতি। অফিসে, আদালতে এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে সুস্থ নিয়মানুবর্তী এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে শাসকশ্রেণী সুস্থ কর্মসংস্কৃতি রক্ষায় বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিৎ।

১৪। উদ্যোগ, দক্ষতা এবং সততা। সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে শাসকশ্রেণীকে উদ্যোগী, দক্ষ, সৎ এবং কর্মঠ হওয়া প্রয়োজন।

১৫। তীক্ষ্ণ বোধশক্তি এবং সহমর্মিতা। শাসক বা শাসকশ্রেণীকে তীক্ষ্ণ বোধশক্তিসম্পন্ন এবং সহমর্মী ও জনগণের প্রতি সহৃদয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপরোক্ত বিশেষ সর্তাবলী পালনের মাধ্যমে শাসক কিংবা শাসক গোষ্ঠী রাষ্ট্রে 'সুশাসন' প্রবর্তন এবং রক্ষা করতে সক্ষম হবেন।

**সুশাসন-এর অষ্ট অঙ্গ**

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত 'সুশাসন' বা Good Governance বিষয়টি বুদ্ধোপদেশ দ্বারা ফলিত বা ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা যেতে পারে। 'সুশাসন' বা Good Governance অধুনা প্রচলিত একটি শব্দ হলেও পালি বা বৌদ্ধ সাহিত্য-এও এর উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। পালি অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিধায় 'সুশাসন' শব্দটি কিংবা তার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, যদিও রাষ্ট্রকর্মের বিভিন্ন বর্ণনায় সুশাসন বা সুপরিচালনা-এর উদাহরণ বহুল পরিমাণে লভ্য। সুশাসন-এর মূল লক্ষ্য হলো সামগ্রিকভাবে আপাত দুঃসাধ্য সর্বোত্তম ক্রমবর্ধমান মানবিক উন্নতি সুনিশ্চিত এবং তা বাস্তবায়িত করা। শাসন বা পরিচালনা-এর মুখ্য উদ্দেশ্য কোন নীতি-নির্ধারণ এবং তার বাস্তবায়ন অথবা প্রত্যাখান। কিন্তু সুশাসন-এর কার্যক্রম হলো সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠান্তে সেগুলিকে সর্বপ্রকার দুর্নীতিমুক্ত করে মানবাধিকার রক্ষা করা। 'শাসন'-এর নিম্নোক্ত আটটি অঙ্গ হলো :

(ক) অংশগ্রহণ বা Participation—রাষ্ট্রীয় সুশাসনের (১) মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রের সকল নর নারীর শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের উপর; (২) এই অংশদারীত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সামিল করে; (৩) এই নিরপেক্ষ অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বাক্ স্বাধীনতা এবং সুসংগঠিত সুশীল সমাজ।

(খ) আইনের শাসন বা Rule of Law—আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন (১) নিরপেক্ষ সৎ আইনসম্মত বিধিব্যবস্থা; (২) মানবাধিকার রক্ষায় পূর্ণ নিরাপত্তা, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের; (৩) স্বাধীন বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে নিরপেক্ষভাবে আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ।

(গ) স্বচ্ছতা বা Transparency—সুশাসন ব্যবস্থায়ও স্বচ্ছতার তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, যেমন (১) আইন ও বিধি মোতাবেক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার রূপায়ন; (২) শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত লাভ করে যথাবিহিত

ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন; (৩) যে কোন বিষয়ে প্রভূত তথ্য যে কোন নাগরিকের কাছে যেন সহজলভ্য হয়।

(ঘ) প্রতিবেদনশীলতা বা Responsiveness—সুশাসনের ফলে রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারকবৃন্দ এক সুনির্দ্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কর্ম রূপায়নের জন্য দায়বদ্ধ।

(ঙ) ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা বা Consensus Orientation—এর জন্য প্রয়োজন; (১) সমাজের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে মধ্যস্থতার দ্বারা এক অবাধ ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সহমতে উপনীত হওয়া; (২) ঐক্যমত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে আগ্রহ।

(চ) সমকক্ষতা এবং সর্বব্যাপকতা বা Equity and Inclusiveness—সমাজের মঙ্গল নির্ভর করে; (১) সকল ব্যক্তি যেন অনুভব করেন যে তাঁদেরও সমাজে গুরুত্ব রয়েছে এবং তাঁরা যেন সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন নন; (২) সকল শ্রেণীর মানুষের বিশেষ করে যাঁরা পিছিয়ে আছেন তাঁদের উন্নতি ও মঙ্গলের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা।

(ছ) কার্যকারিতা এবং দক্ষতা বা Effectiveness and Efficiency—সুশাসনের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো (১) প্রাপ্ত সকল প্রকার সম্পদের সুব্যবস্থা করে বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রদান, (২) পরিবেশ সুরক্ষার দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান সুব্যবস্থার।

(জ) দায়বদ্ধতা বা Accountability—সুশাসনের প্রাথমিক শর্ত হলো দায়বদ্ধতা যার জন্য প্রয়োজন (১) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং সুশীল সমাজ কর্তৃক সকল কার্যকাণ্ডের দায়ভার বহন করা; (২) সদস্যদের প্রতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি আত্মিক ও বাহ্যিক কর্মের জন্য দায়বদ্ধতা।

রাষ্ট্র সংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা বা United Nations Economic and Social Commission For Asia and Pacific (UNESCAP)—এর সনদেও রাষ্ট্রীয় সুশাসনের উপরোক্ত আটটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বস্তুতঃ সুশাসনের বাস্তব উদ্দেশ্যই হলো সর্বপ্রকার বিভেদ বৈষম্য যতদূর সম্ভব হ্রাস করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বক্তব্যে মনোযোগী হয়ে বর্তমান ও আগামী সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী সম্যক নীতি নির্ধারণ করা।

### পালি সাহিত্যে 'সুশাসন'

পালি সাহিত্যে 'সুশাসন'-এর বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক 'সুশাসন'-এর সংজ্ঞা প্রদান করে অষ্ট অঙ্গের উল্লেখ করা যায়। অনুরূপ অষ্ট অঙ্গ-এর ন্যায় গৌতম বুদ্ধও অনেক পূর্বেই 'অরিয় অটঠঙ্গিক মগ্গ' বা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' ব্যাখ্যা করেন।

অরিয় অটঠ্ঙ্গিক মগ্গ বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উত্তর প্রদেশের সারনাথে প্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের প্রতি গৌতম বুদ্ধের সর্বপ্রথম ধর্মদেশনা 'ধম্মচক্কপ্পবত্তন-সুত্ত'-এ যে 'অরিয় অটঠ্ঙ্গিক মগ্গ' বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'-এর বিষয় উল্লেখ করেছিলেন তা যেন 'সুশাসন'-এর উপরোক্ত আট বা অষ্ট অঙ্গের ব্যাখ্যার প্রতিধ্বনি। রাষ্ট্রীয় 'সুশাসন'-এর সেগুলির প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখ দাবী করে। এই ধর্মোপদেশে 'মজ্ঝিমা পটিপদা' বা 'মধ্যম পন্থা' নির্দেশ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত 'অরিয় অটঠ্ঙ্গিক মগ্গ' বা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন বুদ্ধ :

(ক) 'সম্মা-দিট্ঠি' বা সম্যক দৃষ্টি—অভ্রান্ত সত্য জ্ঞানই ফলিত বৌদ্ধধর্মের প্রথম সোপান যার সাহায্যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অংশদারিত্ব বা অংশগ্রহণ সহজ হয়। 'ধর্ম্মপদ-অট্ঠকথা'য় এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ 'পত্তিকো' অর্থাৎ 'অংশগ্রহণকারী' উল্লিখিত হয়েছে। সম্যক দৃষ্টির দ্বারা অন্য ব্যক্তির সন্দেহ নিরসন করে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা সঠিক পথে পরিচালিত করে অপরকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যকর্মে সামিল করা যায়।[২]

(খ) 'সম্মা-সঙ্কপ্পো' বা সম্যক সঙ্কল্প—পরিভোগ সঙ্কল্প ত্যাগ করে বিরাগতা প্রাপ্তি, ব্যাপাদসঙ্কল্প থেকে বিরত হয়ে মৈত্রী সঙ্কল্প লালন, বিহিংসা প্রতিবিরত হয়ে করুণা সম্পন্ন হওয়াকেই সম্যক সঙ্কল্প রক্ষা করা বলে। অর্থাৎ অনাসক্ত মৈত্রীভাবাপূর্ণ অহিংসিত হয়ে স্বার্থপরতা, বিদ্বেষভাব এবং নিষ্ঠুরতা পরিহার করে রাষ্ট্রীয় আইনের শাসনানুসারে নীতিকর্ম পালনের মাধ্যমে সম্যক সঙ্কল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব।[৩]

(গ) 'সম্মা-বাচা' বা সম্যক বাক্য—মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকা, সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, বিশ্বাস্য, বিষমবাদী, সন্ধিকর্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করে কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা। এ প্রসঙ্গে পালি প্রতিশব্দ 'বিনিবিজ্ঞান' অথবা 'বিশ্লেষণ' স্মর্তব্য[৪]। কোন নীতি-নির্ধারক বিষয়ে রীতিনীতি মেনে সত্যবাক্য উচ্চারণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা সম্ভাবিত।

(ঘ) 'সম্মা-কম্মান্ত' বা সম্যক কর্ম-সৎ ও পবিত্র কর্মকারী হওয়া। প্রাণীহত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, কামসমূহে মিথ্যাচার থেকে বিরত থেকে সমাজের প্রতি 'দায়বদ্ধ' হয়ে প্রতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্ব যুক্তিগ্রাহ্য সময়ের মধ্যে পালন করে কর্মের দ্বারা সুশাসন-এ অংশগ্রহণ করা যায়।

(ঙ) 'সম্মা আজীব' বা সম্যক জীবিকা—ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দ 'ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা' কল্পে কায়িক ও বাচনিক পাপে লিপ্ত না হয়ে অর্থাৎ প্রাণী হত্যা ইত্যাদি থেকে বিরত থেকে মদ্য, মৎস্য, মাংস ও বিষ ক্রয়বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না করে 'একমত' এবং একতাবদ্ধ হয়ে সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোগী হওয়ার দ্বারা রাষ্ট্রীয় সুশাসন প্রবর্তন ও রক্ষা করতে পারেন।

(চ) 'সম্মা-বায়াম' বা সম্যক প্রচেষ্টা-কায়িক বাচনিক ও মানসিক সর্বপ্রকার অনুকূল কর্ম পরিহার করে সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রতি নির্বিশেষে 'সমদর্শিতা/ন্যায়বিচার এবং সর্ব ব্যাপকতা' প্রদর্শন করে নাগরিকবৃন্দকে মূল স্রোতে স্থাপন করে এক উন্নততর স্তরে উন্নীতকল্পে নিয়োজিত হওয়ার দ্বারা রাষ্ট্রীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভাব্য।[৫]

(ছ) 'সম্মা-সতি' বা সম্যক স্মৃতি—নিরবদ্য সৎ স্মৃতি দ্বারা 'কার্যকারিতা এবং দক্ষতা' বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের সদব্যবহার করে পরিবেশ সুরক্ষা করার প্রয়াস অব্যাহত রাখা। এ প্রসঙ্গে পালি শব্দ 'নেপুঞ্জ' বা 'দক্ষতা' স্মর্তব্য।[৬]

(জ) 'সম্মা-সমাধি' বা সম্যক সমাধি—কুশল একাগ্রচিত্তে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পালি 'অনুবিজ্জক' বা নিরীক্ষকের দায়িত্ব বহন করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যদের প্রতি 'দায়বদ্ধতা' পালন করে রাষ্ট্রীয় সুশাসনের অংশীদার হওয়া যায়।[৭]

এভাবে এক একটি করে 'মগ্গ' বা মার্গ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় সুশাসনের আট অঙ্গাবলীসমন্বিত সুদৃঢ় ইমারতটি গড়ে উঠেছে 'অরিয় অট্ঠাঙ্গিক মগ্গ' বা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'-এর ভিত্তিভূমির উপর। এই মার্গ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যেমন আবশ্যিক, তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। পালি 'শোভন শাসন'-ই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় সুশাসন-এ।

অনুরূপ আরো আটটি 'সুশাসন' সংশ্লিষ্ট পালি শব্দ পালী সাহিত্য থেকে রাষ্ট্রীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োগিক অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে। সেগুলি হলো : (১) অপ্পমাদ বা অপ্রমাদ[৮] (২) মেত্তা বা মৈত্রী, (৩) করুণা, (৪) মুদিতা, (৫) উপেক্খা বা উপেক্ষা, (৬) সতি বা স্মৃতি[৯], (৭) সাধুশীলিয় বা সৎ চরিত্র[১০], এবং (৮) ঝান বা ধ্যান বা চিত্তের একাগ্রতা[১১]।

বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে রাষ্ট্রীয় সুশাসনের জন্য এই অষ্টবিধ গুণাবলীর উপস্থিতি প্রয়োজন।

## 'নিকায়' গ্রন্থে 'সুশাসন'

পালি 'দীঘ-নিকায়' গ্রন্থে উপলব্ধ রাজা মহা সম্মত-এর উপাখ্যান বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে সম্ভবতঃ সর্ব প্রথম একটি দলিল।[১২] এই উপাখ্যানে দেখা যায় রাজ্যের মুখ্য প্রশাসক প্রথমতঃ একজন উচ্চতম শ্রেণীর সামাজিক ভৃত্য যিনি জনগণের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনার নির্বাচিত ব্যক্তি এবং বহুলাংশে রাজ্যের জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। বৌদ্ধ রীতি অনুযায়ী 'শাসন'-এর সূত্রপাত হল জনগণের সঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে। উপরোক্ত উপাখ্যান-এর ভিন্ন একটি বর্ণনা 'চক্কবত্তি-সীহনাদসুত্তন্ত'-এ পাওয়া যায়।[১৩] এটিতেও এক আদর্শ রাষ্ট্রের উল্লেখ রয়েছে। চুক্তিবদ্ধ এরকম আদর্শ নির্বাচিত 'রাজা' নির্বিঘ্নে শাসনকর্ম দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী রাজাদের জীবনযাত্রার অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে অরাজকতা দেখা যায়। রাষ্ট্রের

শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। চারিদিকে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে জনগণ আকস্মিকভাবে সঙ্ঘ বা শঙ্খ নাম এক ধার্মিক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে রাষ্ট্রের ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এভাবেই কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে সমাজ এবং প্রথম সরকার-এর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে প্রথম আদর্শ শাসক তথা রাজা নির্বাচিত হন। বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুসারে ধার্মিক রাজা সমগ্র মানবসমাজের হিতার্থে এবং মঙ্গলের জন্য ন্যায়পরায়ণ এবং বিচারের ক্ষেত্রে তিনি পক্ষপাতহীন হবেন। নাগরিকদের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি সুশাসন সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে। আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমতা এবং ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করাই হলো তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। পালি সাহিত্যে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে প্রথম রাজা বা শাসক হলেন জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন নেতা যাঁর প্রাথমিক কর্তব্য হলো অপরাধ দমন এবং জনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ন্যায্য কর ধার্য করা। এই ক্ষমতা তিনি লাভ করেন জন্মগত কারণে কিংবা পুরুষাণুক্রমে নয়, দক্ষতা ও সুশাসন-এর উপর তা নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম বিজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে স্বৈরাচারী একনায়ক রাজার ক্ষমতা হ্রাস করে নৈতিকতার সহযোগে জনকল্যাণে তার প্রয়োগ অনুমোদন করে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং অরাজকতা বিনাশ করার জন্য সর্বগুণ সমন্বিত এক সুপুরুষকে রাষ্ট্রের শাসকরূপে মনোনীত করে তাঁকে 'মহাসম্মত' আখ্যায় বিভূষিত করা হয়, কারণ তিনিই প্রথম সর্বসম্মতরূপে মনোনীত। নির্বাচিত সুশাসক যিনি রাজ্যের এবং জনগণের দায়িত্ব ভার বহন করতে সক্ষম। পালি সাহিত্য অনুসারে রাষ্ট্রীয় সুশাসন নির্ভর করে জনগণ এবং মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে একটি সৎ চুক্তি রূপায়ণের দ্বারা। সুশাসন প্রসঙ্গে 'চক্কবত্তি-সীহনাদ-সুত্তন্ত'-এ যা বলা হয়েছে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য[১২]। এই বুদ্ধোপদেশে পূর্বের এক আদর্শ সামাজিক অবস্থা চিত্রায়িত হয়েছে। সেই সময়ে দেশে এবং সমাজে সুশাসন প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে পরবর্তী শাসকদের জনকল্যাণমূলক চিন্তাভাবনার অভাবের জন্য। সুতরাং অরাজকতার আবির্ভাব ঘটে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এই অরাজকতা থেকে মুক্তি লাভ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণ এবং এক ধার্মিক রাজার মধ্যে সামাজিক নৈতিক চুক্তির মাধ্যমে। সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে। এই মতবাদ আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। ধার্মিক প্রজারঞ্জন রাজার বিবরণ বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে রয়েছে। এখানে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ কোন আনুষ্ঠানিক 'ধর্ম' নয়, এ হলো সাধারণ শীল পালনের দ্বারা সৎ এবং সুষ্ঠু জীবনযাপন।

### বৌদ্ধ প্রজাতন্ত্র এবং সুশাসন

পালি সাহিত্যে সাধারণতঃ দু'ধরনের প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় : (১) কোন বিশেষ কুল বা বংশ-এর জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র। যথা—শাক্য, কোলিয়, মল্ল প্রভৃতি

এবং (২) অনেকগুলি কুল বা বংশ-এর সমাহারে গঠিত প্রজাতন্ত্র যেমন—বজ্জি, যাদব ইত্যাদি। কিন্তু বৌদ্ধ প্রজাতন্ত্রের একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়। এখানে উত্তরাধিকারসূত্রে কোন শাসক মনোনীত হন না, শাসনকর্তা হবেন একজন নির্বাচিত ব্যক্তি যাঁর উপর রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হয় এবং এই কর্মের জন্য পরিবর্তে প্রজাদের কাছ থেকে তিনি নির্দ্দিষ্ট হারে ফসলের অংশ লাভ করেন যেমন বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন জনগণের ভোটে এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারী তহবিল থেকে নিয়মিত অর্থ গ্রহণে তিনি অধিকারী হন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছিল গণপরিষদ, মন্ত্রী পরিষদ এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলি। আধুনিক পঞ্চায়েতের ধাঁচে বৌদ্ধ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গ্রামসভা, নিযুক্ত হয়েছিলেন গ্রাম পরিচালনার জন্য গামনি, গামিক বা গামভোজক প্রভৃতি কর্মকর্তা। রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য 'দূত'ও নিয়োগ করা হতো অপর রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক স্থান রক্ষাকল্পে। উল্লেখ্য, সম্মিলিত বজ্জিদের প্রতি 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ বা সুশাসনের জন্য একান্তভাবে কাম্য। গুরুত্ব বিবেচনায় সেগুলির উল্লেখ এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেগুলি হলো :

১। সভা-সমিতির মাধ্যমে সর্বদা একত্রিত হওয়া।

২। একতাবদ্ধভাবে সভা-সমিতিতে সম্মিলিত হওয়া, সভান্তে একত্রে স্থান ত্যাগ এবং কোন নতুন করণীয় উপস্থিত হলে সকলে একত্রে সম্পাদন করা।

৩। সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নতুন কোন প্রকার দুর্নীতি চালু না করে, পূর্ব প্রচলিত সুনীতি উচ্ছেদ না করে পূর্বে গৃহীত নীতিগুলি যথাযথভাবে পালন করা।

৪। বয়োবৃদ্ধদের সৎকার করা, তাঁদের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করা, সম্মান ও পূজা করা এবং তাঁদের আদেশ পালন উচিত মনে করা।

৫। অন্য কুলবধূ ও কুলকুমারীদের বলপূর্বক ধরে এনে স্বীয় গৃহে আবদ্ধ না রাখা বা তাঁদের প্রতি কোন প্রকার অশোভন আচরণ না করা।

৬। স্বগ্রামের বাইরে কিংবা অভ্যন্তরে পূর্বপুরুষ দ্বারা নির্মিত সকল ধর্মস্থানের যথাযথ সংস্কারসাধন, বিধি অনুযায়ী পূজা করা এবং ধর্মস্থানগুলির উদ্দেশ্যে পূর্বপুরুষের প্রদত্ত সম্পত্তি নিজেরা ভোগ না করে ধর্মকর্মে ব্যয় করা।

৭। অর্হৎ ও শীলবান ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দানের দ্বারা সেবা ও রক্ষা করা, তাঁদের সর্ববিধ সুখসুবিধার ব্যবস্থা করা, দেশে যেসকল অর্হৎ আসেন নি কি উপায়ে তাঁদের আনা যায় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং গ্রামে অবস্থিত অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদের নিরাপদ অবস্থান সুনিশ্চিত করা।

**'ধম্মপদ' গ্রন্থে 'সুশাসন'**

'ধম্মপদ' গ্রন্থে 'সুশাসন'-এব প্রতিফলন দেখা যায় নিম্নোক্ত গাথাগুলিতে. : শত্রুতা

দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়, এই সনাতন ধর্ম।

'যিনি শীলবান, সম্যকদর্শন সম্পন্ন, সদ্ধর্মেস্থিত, সত্যবেদী ও আত্ম কর্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত, তিনি জনসাধারণের প্রিয় হন।' 'মৈত্রী' দ্বারা ক্রোধ জয় করবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করবে, ত্যাগের দ্বারা কৃপণকে জয় করবে ও সত্যের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করবে'।[১৩]

গাথাগুলিতে যেমন একদিকে ব্যক্তিগত চারিত্রিক শুদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রতিভাত হয়েছে মনুষ্যত্বের সম্মান, সুরক্ষিত মানবিক অধিকার এবং ক্রমবর্ধমান মানব উন্নতি যা সুশাসন প্রবর্তনের আবশ্যিক শর্তাবলী।

**সম্রাট অশোক এবং 'সুশাসন'**

একজন আদর্শ রাজা বা শাসক-এর মুখ্য কর্তব্য হল সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি সমব্যবহার। কারণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ন্যায়পরতার প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা পক্ষপাতিত্বেরই নামান্তর। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ভারতীয় সম্রাট অশোক নিজে নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হলেও স্বদেশে কিংবা বিদেশে উক্ত ধর্ম প্রচার করেছিলেন একথা মনে করার পক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নেই। সর্বধর্মের সারবস্তুরূপে কতকগুলি চারিত্রনীতিকেই তিনি 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছিলেন এবং সর্বসাধারণের পক্ষে এই মৌলিক ধর্ম পালনের উপযোগিতার উপরেই তিনি জোর দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি অপেক্ষাপাতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করতেন একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।"[১৪] রাষ্ট্রশাসনে ধর্মবিষয়ে এপ্রকার নিরপেক্ষনীতি সম্রাট অশোককে এক সুশাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বস্তুতঃ নিরপেক্ষতার জন্যই তাঁর সময়ে সুশাসন এতোখানি গুরুত্বলাভ করে। পরধর্মে সহিষ্ণুতা অশোকের শাসননীতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর নিম্নোক্ত শিলালিপিগুলি প্রতিটি ধর্মের প্রশংসা করে লিখিত। প্রত্যেক ধর্মমতে সংযম পবিত্রতার উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি লিখেছেন : দেবানং পিয়ো পিয়দসি রাজা সর্বত ইছতি সবে পাসংডা বসেয়ু। সবে তে সয়মং চ ভাবসুধিং চ ইছতি'—'দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) ইচ্ছা করেন যেন সর্বত্র সকল (ধর্ম) সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবৃন্দ বসবাস করুন। তাঁদের সকলের সংযম এবং ভাবশুদ্ধি তিনি কামনা করেন' (শিলালিপি সংখ্যা ৭) 'দেবানং পিয়ে পিয়দসি রাজা সব-পাসংডানি চ পবজিতানি চ ঘরস্তানি চ পূজয়তি দানেন চ বিবিধায় চ পূজয়তি নে...সবপাসংডানং সারবডী ভু বহুবিধা। তস ইদং মূলং য বচিগুতী কিংতি আতপপাসংড-পূজা ব পরপাসং ড-গরহা ব নো ভবে...এবং করুং আতপপাসং ডং চ বঢয়তি পরপাসংডস চ উপকরোতি'—'দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ইচ্ছাঃ সকল (ধর্ম) সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, প্রব্বজিত এবং গৃহস্থ-বৃন্দ যেন দান এবং বিবিধ

পূজাপদ্ধতির মাধ্যমে (নিঃশঙ্ক চিত্তে পূজা করেন...সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হলো বিভিন্ন প্রকারে সারবৃদ্ধি। (কিন্তু) এসবের মূল হলো বাক্যগুপ্তি, যেমন (অযথা) স্বীয় ধর্মের পূজা বা প্রশংসা এবং পরধর্মের নিন্দা না করা—এভাবে আচরণ করলে নিজ সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ধর্মের উপকার সাধিত হয় (শিলালিপি সংখ্যা ১২)।

সকল ধর্মের প্রতি সমব্যবহার এবং ধর্মনিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের জন্য সম্রাট অশোক 'ধর্ম-মহামাত্য' নিয়োগ করে তিনি লিখিয়েছিলেন 'ধং ম-মহামাতা কটা' এবং 'দেবানংপিয়ে পিয়দসি হেবং আহ ধং ম-মহামাতা পি মে তে বহুবিধেষু অঠেসু আনগহাকসু বিয়াপটাসে পবাজিতানং চেব গিহিথানং চ সব-পাসংডেসু পি চ বিয়াপটাসে সংঘধসি পি মে কটে ইমা বিয়াপটা হোহংতি তি হেমেব বাভনেসু আজীবিকেসু পি মে কটা'—দেবতা প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) বলেন : আমার ধর্ম-মহামাত্যবৃন্দ বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন, যেমন, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের রাজানুগ্রহ লাভের ক্ষেত্রে এবং সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে; (বৌদ্ধ) সঙ্ঘের (সুবিধা-অসুবিধাগুলির) প্রতি লক্ষ্য রাখতে, ব্রাহ্মণ, আজীবিক, নিগ্রন্থ অর্থাৎ জৈন সন্ন্যাসীদের এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের সুযোগ সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে আমি তাঁদের নিয়োগ করেছি। সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য আমি ধর্ম-মহামাত্য নিযুক্ত করেছি' (শিলাস্তম্ভ সংখ্যা ৭)।

এই সকল শিলালিপিতে স্পষ্ট যে ধর্ম সম্প্রদায়গুলির ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে রাজ্যে 'সুশাসন' প্রবর্তন করেছিলেন।[১৫] তাঁর শিলালিপিগুলিতে একজন দক্ষ প্রশাসকরূপে জনগণের প্রতি 'দায়বদ্ধতা' সম্রাট অশোক স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'শাসন' বলতে তাঁর কাছে তাত্ত্বিক অর্থে 'একনায়কতন্ত্র' বুঝালেও তিনি সমস্ত আইনের উর্ধ্বে উঠে স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা সুশাসন-এ পরিণত করেছিলেন। তাই তিনি পিতৃত্বের সমস্ত দায় স্বীকার করে ঘোষণা করতে পারলেন : 'সবে মুনিসে পজা মমা অথা পজায়ে ইছামি হকং কিংতি সবেন হিতসুখেন হিদলোকিক পাললোকিকের যুজেবা তি তথা...মুনিসেন পি ইছামি হকং'—'সকল মানুষই আমার সন্তান এবং আমি ইচ্ছা করি আমার সন্তানরা এই পৃথিবীর সকল কল্যাণ এবং সুখ ভোগ করুক। এভাবেই আমি সকল সন্তানের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি' (কলিঙ্গ শিলালিপি সংখ্যা ১)। তিনি আরো ইচ্ছা করেছিলেন, সদ্য বিজিত কলিঙ্গবাসীরা যেন মনে করেন রাজা তাঁদের পিতাসদৃশ, তিনি সন্তানস্নেহে তাঁদের ভালবাসেন, তাঁরা রাজার নিকট সন্তানতুল্য। কিন্তু কলিঙ্গদেশের অধিবাসীদের প্রতি পিতৃস্নেহের দায়বদ্ধতা রাজা কেবলমাত্র নিজের মধ্যে সীমায়িত রাখেন নি, তা তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন তাঁর দ্বারা নিযুক্ত রাজ-অমাত্যদের মধ্যেও। পিতা একজন সুদক্ষ ধাত্রীর হস্তে তাঁর সন্তানদের দায়িত্বভার অর্পণ করে এক দৃঢ় বিশ্বাসে আশ্বস্ত হন : অথ হি পজং বিয়তয়ে ধাতিয়ে নিমিজিতু অসুখে হোতি বিয়তধতি ছগতি মে পজং সুখং পলিহতবে হেবং মম

লাজুক কতা জনপদম হিতসুখায়'—'যেমন কোনো ব্যক্তি তাঁর সন্তানদের দক্ষ ধাত্রীর হাতে তুলে দিয়ে ভাবেন : এই দক্ষ ধাত্রী যত্নসহকারে আমার সন্তানদের প্রতিপালন করতে সমর্থ হবেন, সেরকম রজ্জুকবৃন্দ আমার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন জনগণের মঙ্গল এবং সুখ-এর নিমিত্ত' (স্তম্ভলিপি সংখ্যা ৪)। সম্রাট অশোক এই ভাবধারা পোষণ করে যেভাবে জনসাধারণের দায়দায়িত্ব বহনের বিষয় উল্লেখ করেছেন আধুনিক তথাকথিত আইন সভা বা বিধানমণ্ডলীতে নির্বাচিত মাননীয় সদস্যদের নিকট বা কোন রাষ্ট্র নায়কের কাছে তা আশা করা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে সম্রাট অশোকের সঙ্গে জনগণের যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা আধুনিক গণতন্ত্রে নির্বাচিত আইন সভার সদস্যদের সম্ভাবনার চেয়ে অনেকাংশে আন্তরিক, প্রত্যক্ষ এবং স্বাভাবিক ছিল। মহৎ হৃদয় দ্বারা রাষ্ট্রের অধিকর্তারূপে সম্রাট অশোক তাঁর জনসাধারণের সঙ্গে অভিন্ন, অচ্ছেদ্য, নিবিড় এক আত্মিক যোগ স্থাপন ও রক্ষা করতে সমর্থ হন।

সম্রাট অশোক 'সুশাসন' ব্যাখ্যা করে জনগণের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের পরিচয় রেখেছেন তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যে : 'অতিকতং অংতরং ন ভূত-পূর্ব সবে কালে অথ-কম্মেব পটিবেদন ব ত ময়া এবং কতং সবে কালে ভুংজমানস মে ওরোধনস্থি গভগরস্থি বচমিব বিনিতমিহচ উয়ানেসু চ সর্বত্র পটিবেদকা স্তিতা অথে জনস পটিবেদথে ইতি সর্বত্র চ জহস অথেকরোমি। নাস্তি হি মে তোসো উস্তেনস্থি অথ-সংতী রনয় ব কর্তব্য-মতে হি মে সর্ব-লোক-হিতং তস চ পুন এস মুলে উস্তনং চ অথসংতী রণ চ নাস্তি হী কম্মতরং সর্ব-লোক-হিতং তস চ পুন এস মুলে উস্তনং চ অথসংতীরণ চ নাস্তি হী কম্মতরং সর্ব-লোক-হিতণ 'পূর্বে বহু যুগ আগে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা সুপরিচালিত ছিল না। অথবা প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রতিবেদনের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু আমি সর্বক্ষণ প্রতিবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা করেছি। যখন আমি আহারে ব্যস্ত কিংবা শয়নকক্ষে শায়িত বা বিশ্রামরত বা সকটে পরিভ্রমণরত অথবা উদ্যানে ক্রীড়ারত সর্বত্র প্রতিবেদকবৃন্দ জনগণসংক্রান্ত প্রশাসনের জরুরী বিষয়গুলি আমার গোচরে আনবেন। শাসনকর্ম সম্পাদনে আমার তৃপ্তি কিংবা ক্লান্তি নেই। আমার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হলো জগতের মঙ্গল সাধন এবং তা করতে হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রয়াস-এর প্রয়োজন। বাস্তবিকই জগতের মঙ্গল সাধন করার চেয়ে অন্য কিছুই বড়ো নয়' (শিলালিপি সংখ্যা ৬)।

ঐতিহ্য অনুসারে তিনটি ঋণ অর্থাৎ (ক) ধর্ম রক্ষায় দেব-ঋণ, (খ) বিদ্যার্জনে ঋষি-ঋণ এবং (গ) সামাজিক শান্তি রক্ষার্থে জ্ঞাতি-ঋণ। প্রত্যেক ব্যক্তির এই ঋণসমূহ শোধ করা উচিত। এই তিনটি ছাড়াও সম্রাট অশোক তাঁর জনসাধারণকে স্মরণ করিয়া দিয়েছেন রাজাকে, বিশেষ করে, আরও একটি ঋণশোধ করার জন্য তৎপর হতে হয়। তাই তিনি মনে করেন : 'যচ কিংচি পরক্রমমি অহং কিংতি ভূতানং আনংনং গচ্ছেয়ং ইধ চ নানি

সুখেপয়ামি পরত্র চ স্বগং আরাধ যংতু ত'— এবং আমি যেকোনো প্রচেষ্টাই করি না কেন, জীবিত প্রাণীদের (বা জনগণের) প্রতি ঋণ শোধের জন্য দায়বদ্ধ এবং আমি তাঁদের সকলের সুখ এবং পরবর্তীকালে স্বর্গ লাভ কামনা করি' (শিলালিপি সংখ্যা ৬)।

বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও সম্রাট অশোক প্রত্যেক জনপদ পরিভ্রমণ করে জনগণকে দর্শন দিয়ে তাদের সুখদুঃখের কথা শুনে তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন।

**'জনপদস জনস দমনে'**

'জনপদের জনগণকে দর্শন' (শিলালিপি সংখ্যা ৮)। লক্ষ্যণীয়, তিনি পূর্বপুরুষদের ন্যায় মৃগয়া কিংবা ব্যক্তিগত সুখের জনপদগুলি পরিভ্রমণ করতেন না, তিনি গ্রামের গঞ্জে যেতেন সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সাফাৎ করে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাত হওয়ার জন্য। এতৎসত্ত্বেও তাঁর সাম্রাজ্যের বিশালত্বের জন্য প্রতিটি গ্রামে, নগরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। এ বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। তাই তিনি শিলালিপিগুলির সাহায্যে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তবুও তিনি স্বীয় সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সজাগ থেকে তিনি একটি শিলালেখতে লিখিয়েছিলেন : 'তত্র একদা অসমতং লিখিতং অসে দেসং বা সচ্চয় কারণং বা অলোচেটপ লিপিকারাপরাধেন বা'—'এখানে কিছুটা অসম্পূর্ণরূপে লিখিত হয়েছে স্থানবিশেষে অপ্রয়োজনীয়বোধে অথবা অন্য কোন কারণে বা লিপিকারের অক্ষমতার কারণে (শিলালিপি সংখ্যা ১৪)। সম্রাটের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর আদেশে উৎকীর্ণ এই শিলালিপিগুলিতে। সুশাসকরূপে সম্রাট অশোক সুশাসক-এর প্রথম অঙ্গ 'অংশগ্রহণ' Participation রূপায়িত করেছিলেন, তাঁর রাজকর্মে সাধারণ নরনারী, রাণী, পুত্র, পৌত্র এবং বিভিন্ন পদের আধিকারিকবৃন্দের মিলিত উদ্যোগ এবং অংশগ্রহণ-এর মাধ্যমে। এভাবে তিনি সাম্রাজ্যে এক উন্নততর 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এছাড়া সম্রাট অশোক তাঁর 'পরিসা' বা মন্ত্রীপরিষদ এবং 'রজ্জুক', 'যুক্ত', 'প্রাদেশিক', 'মহামাত্য', 'পটিবেদক' বা সংবাদ প্রতিবেদনকারী, 'ধংম-মহামাতা' বা ধর্ম-মহামাত্র প্রভৃতি মন্ত্রী এবং আধিকারিকদের নিজের 'ঐকমত্য' প্রতিষ্ঠা করে জনগণের মধ্যে সুশাসন রক্ষা করতে তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন : 'লাজুকা মে বহুসু পাণ-সত-সহসেসু, জনসি আয়তা'—'আমার দ্বারা রাজুকবৃন্দ শত-সহস্র ব্যক্তির (মঙ্গলার্থে) ভারপ্রাপ্ত হন' (স্তম্ভলিপি সংখ্যা ৪) এবং 'সর্বত বিজিতে মম যুতা চ রাজুকে চ প্রাদেসিকে চ পংচসু পংচসু বসেসু অনুসমোজনং নিযাতু'—'আমার রাজ্যের সর্বত্র যুক্ত ও রাজুক আধিকারিকবৃন্দ এবং প্রাদেশিক প্রশাসকদের (জনগণের হিতসুখ পর্যবেক্ষণের জন্য) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিভ্রমণার্থে নিযুক্ত হন' (শিলালিপি সংখ্যা ৩)। 'রজ্জুক'দের কর্ম এবং দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট করে জানালেন : 'লাজুকা অস্বথ অভীতা কম্মানি পবতয়েবু জনস জনপদসু হিত-সুখং উপদহেবু অনুগহিনেবু চ সুখিয়ন দুখিয়ানং জনিসন্তি ধম্ম-যুতেন চ বিয়োব দিসংতি জনং জনপদং

কিংতি হিদতাঞ্চ পলতং চ আলাধয়েবু তি'—'রজ্জুকেরা দৃঢ়সঙ্কল্প এবং ভীতিশূন্য হবেন, নগর জনপদ-এর অধিবাসীদের মঙ্গল এবং সুখ বৃদ্ধির জন্য কর্মরত থাকবেন এবং তাঁদের সহায়ক এবং জনগণের সুখ দুঃখ বিষয়ে অবহিত হয়ে নগর ও জনপদ-এর অধিবাসীদের ইহ এবং পরলোক-এ সুখশান্তি লাভার্থে অবিরত পরামর্শ দেবেন' (স্তম্ভলিপি সংখ্যা ৪)।

সম্রাট অশোকের সুশাসন-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো উড়িষ্যার তোসলি বা বর্তমান ধৌলি গিরিগুহায় লিখিত তাঁর অমূল্য অনুশাসন। স্থানীয় মহামাত্যদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় তিনি জানালেন, তোসলির মহামাত্যবৃন্দ যাঁরা ঐ নগরের ন্যায়াধীশও বটে তাঁরা যেন সম্রাটের ইচ্ছাপূরণ করতে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে 'মধ্যম পন্থা' অবলম্বন করেন অর্থাৎ দুই অন্তিম পন্থা পরিহার করেন—তাঁরা বিচারের বিষয়ে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা অনৈতিক, অতি বিলম্বিত রায় প্রদান থেকে যেন বিরত থাকেন। ন্যায়পরায়ণ হয়ে অকুশল চিন্তা, ঈর্ষা, কোপনস্বভাব, নিষ্ঠুরতা, পীড়ন পরিত্যাগ করে তাঁরা যেন বিচারে অংশগ্রহণ করেন। অনুরূপ উপদেশ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বস্তুতঃ যিনি বিচার করবেন তিনি গুরুতর অপরাধে যেন লঘু দণ্ড না দেন অথবা লঘু অপরাধে যেন গুরু দণ্ডের বিধান না দেন। সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে অপরাধীর যথাযথ শাস্তি বিধান করেন (কলিঙ্গ শিলালিপি সংখ্যা ১)।

**জাপান-এর প্রথম সংবিধান এবং 'সুশাসন'**

দুরপ্রাচ্য জাপানের 'সপ্তদশ বিধি সমন্বিত সংবিধান' হল আইনকানুনসম্বলিত প্রথম দলিল এবং এটিকে জাতির 'ম্যাগনাকার্টা' রূপে অভিহিত করা হয়।

রানী সুইকো (৫৯২-৬২৮)-র রাজত্বকালে রাজপুত্র শোভকু ৬০৪ খৃষ্টাব্দে এই 'সপ্তদশ বিধি সমন্বিত সংবিধানটির সূচনা করেন। এই সংবিধানটি মূলতঃ বুদ্ধোপদেশের উপর নির্ভরশীল। এই সংবিধানে নিম্নোক্ত সতেরোটি বিধি রয়েছে। এই বিধিগুলিতে 'সুশাসন' সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় : (১) সংহতির রক্ষা করা কর্তব্য, বিরুদ্ধবাদ পরিহার করাই উচিত...যখন উচ্চ এবং নীচ ব্যক্তি বন্ধুভাবাপন্ন হন, তখন সরকারি কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল বিষয়সমূহের স্বতস্ফূর্ত সত্য সন্ধান সম্ভব... (২) ...। (৩) যখন তুমি সার্বভৌম আদেশ লাভ করবে, তখন শ্রদ্ধাসহকারে তা শ্রবণ করা তোমার কর্তব্য। প্রভু হলেন স্বর্গের ন্যায় এবং প্রজাবৃন্দ হলেন পৃথিবীসদৃশ। ঊর্ধ্বে স্বর্গ নিম্নে ধরিত্রী মিলিতভাবে তাঁরা স্ব স্ব কর্ম সম্পাদন করেন। আমরা দেখি, পৃথিবী সংহতভাবে আবর্তিত হয়ে চারটি ঋতুতে সুশাসিত হচ্ছে...। (৪) মন্ত্রী এবং আধিকারিকবৃন্দের উচিত তাঁদের ব্যবহারে সশ্রদ্ধ হওয়া। উপরওয়ালার যদি স্বচ্ছতা না থাকে, তাহলে জনসাধারণ বিশৃঙ্খল হতে বাধ্য...সুতরাং আধিকারিকবৃন্দ এবং অমাত্যবৃন্দ সশ্রদ্ধ হবেন, সামাজিক বন্ধন অটুট

হবে। যদি জনসাধারণ সশ্রদ্ধ হন তবে রাজকার্য্য স্বাভাবিকভাবে বিনা আয়াসে সম্পাদিত হবে... (৫) ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকবৃন্দ বিদ্বেষভাব রহিত এবং নিঃস্বার্থ হবেন। তাঁদের নিকট আনীত বিচারের বিষয়গুলি তাঁরা যেন নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন...। (৬) দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা কর্তব্য। এটি একটি প্রাচীনতম বিধি। সুতরাং কোন সৎ ব্যক্তির সৎ কর্ম অবহেলাযোগ্য নয়...। (৭) প্রত্যেক নাগরিকেরই কিছু কর্তব্যকর্ম রয়েছে, এই কর্তব্যকর্মগুলি যেন বিভ্রান্তিকর না হয়। যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে কোন উচ্চ পদ দেওয়া হয়, তখন তা জনগণের উৎফুল্ল অনুমোদনযোগ্য। (৮) সকল আধিকারিকদের উচিত প্রাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অফিসে গমন এবং অধিক রাত্রে প্রত্যাবর্তন। যদি তাঁরা দেরীতে অফিসে আসেন এবং সায়াহ্নে প্রত্যাবর্তন করেন তবে তাঁরা অফিসের কাজ সুসম্পন্ন করতে অক্ষম হবেন। (৯) আন্তরিকতা হল সকল কর্মের মেরুদণ্ড স্বরূপ। (১০) সর্ব প্রকার ক্রোধ পরিহার কর্তব্য। (১১) পুরস্কার এবং শাস্তি যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। (১২) ইচ্ছাকৃতভাবে জেলা আধিকারিকেরা কর ধার্য্য করতে পারবেন না। (১৩) সকল আধিকারিকবৃন্দের নিজ নিজ কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। (১৪) সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের ঈর্ষাপরায়ণতা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। (১৫) ব্যক্তিগত লাভে অনীহা এবং জনগণের লাভে সচেষ্ট থাকাই হল সরকারী কর্মচারীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। (১৬) জনগণকে বলপূর্বক বিনা পারিশ্রমিকে নিয়োগ করা অবাঞ্ছিত। (১৭) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বিবেচ্য এবং বাঞ্ছনীয় নয়।

উপরোক্ত বিধিগুলি জাপানে 'সুশাসন'-এর পক্ষে অনুকূল এবং আজও তা প্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ সুশাসনের বিশিষ্ট দিকগুলির বীজ নিহিত ছিল এবং এখনও আছে বৌদ্ধ অনুশাসনানুমোদিত এই বিধিগুলির মধ্যে।

**মন্তব্য**

সাম্প্রতিককালে একদিকে অন্তরাষ্ট্রীয় এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় এই দুই প্রকার সন্ত্রাস সংঘর্ষ এবং হত্যালীলার মধ্যে জনগণ অসহায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রে আজ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং শাসনব্যবস্থা ভগ্নপ্রায়। বর্তমান এই অরাজক এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হতে প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসক, সহৃদয় সরকার এবং সুশাসন-এর। বুদ্ধবচনে এই রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পন্থা পরিলক্ষিত হয়। গৌতম বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়ে একজন সত্যনিষ্ঠ ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মাৎস্যন্যায়ের বিষয় বিবেচনা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সুশাসকের গুণাবলী উল্লেখ করে উচ্চারণ করেছিলেন :

ক) 'যিনি উদ্যমশীল, স্মৃতিমান, পবিত্রকর্মা ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে কার্য সম্পাদন

করেন এবং যিনি সংযত ও ধর্মতঃ জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তির যশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ('ধম্মপদ'—'অপ্পমাদবগ্গ', গাথা ৪)।

খ) 'যিনি বিচারে (রাগ, দ্বেষ, মোহ ও ভয়বশতঃ) পক্ষপাতিত্ব করেন তিনি ধর্মস্থ (ন্যায়বিচারক) হতে পারেন না। যে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ উভয় দিক বিবেচনা করেন, যিনি ন্যায়তঃ নিরপেক্ষ ও সমদর্শী হয়ে অপরের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করেন তিনিই ন্যায়-ধর্মের রক্ষক, বুদ্ধিমান ও সুবিচারক বলে অভিহিত হন' ('ধম্মপদ'—'ধম্মট্ঠ-বগ্গ', গাথা ১, ২)।

গ) 'যিনি তৃষ্ণামুক্ত, অনাসক্ত, নিরুক্তিপদকুশল (অর্থাৎ ব্যাকরণ অনুসারে শব্দার্থ নির্ণয়ে সুদক্ষ) এবং অক্ষরসমূহের সন্নিবেশকৌশল ও পৌর্বাপর্য প্রয়োগ জানেন, সেই অন্তিমদেহধারী মহাপ্রজ্ঞাই মহাপুরুষ নামে অভিহিত' ('ধম্মপদ'-'তণ্হা-বগ্গ', গাথা-১৯)।

উপরোক্ত গাথাগুলি মানব-মহিমা প্রচার, মানবাধিকার রক্ষা এবং মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি সুনিশ্চিত করে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রবর্তনে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

**পাঠ-সংকেত**


১। 'বিনয়-পিটক', 'মহাবগ্গ', ১ম খণ্ড, সম্পা. এইচ ওল্ডেনবার্গ। লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, ১৯৬৪, পৃঃ ১০; সংযুক্ত নিকায়', ১ম খণ্ড, সম্পাদ. ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ। নালন্দা, পালি পাবলিকেশান বোর্ড, ১৯৫১, পৃঃ ৪২০।

২। 'ধম্মপদ-অট্ঠকথা', ১ম খণ্ড, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ২৭০।

৩। 'পেতবত্থু-অট্ঠকথা', লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ১১৪-১৩০।

৪। 'অত্থসালিনী', লণ্ডন, পালি, টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ২৫৩।

৫। 'বিনয়-পিটক', ২ খণ্ড, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ২৫৮।

৬। 'পুগ্গলপঞ্ঞত্তি', লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ২৫, ৩৫।

৭। 'বিনয়-পিটক', ৫ম খণ্ড, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ১৬১।

৮। 'ধম্মপদ', গাথা ২১।

৯। 'সংযুক্ত-নিকায়', ৪র্থ খণ্ড, নালন্দা, পালি পাবলিকেশান বোর্ড, ১৯৫১, পৃঃ ১২৯-১৬৬।

১০। 'জাতক', ২য় খণ্ড, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ১৩৭।

১১। 'বিসুদ্ধিমগ্গ', লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ১৫০।

১২। 'দীঘ-নিকায়', লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৯৬।

১৩। 'দীঘ-নিকায়', ৩য় খণ্ড, নালন্দা, পালি পাবলিকেশান বোর্ড, ১৯৫১, পৃঃ ৪৬-৬২।

১৪। সেন, প্রবোধচন্দ্র, ধর্মবিজয়ী অশোক'। কলিকাতা, বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভা, ১৯৯৭, পৃঃ ৭৯।

১৫। Barua, Benimadhab, Inscriptions of Asoka (Text). Calcutta, Sanskrit College, 1991, pp. 43-45, 65-70.

তৃতীয় অধ্যায়

# কল্যাণ অর্থনীতি

**সংজ্ঞা :**

সাধারণতঃ অর্থনীতি শব্দের অর্থ হলো 'ধনবিজ্ঞান' বা ধনসম্পত্তি আহরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ক বিজ্ঞান। ধনসম্পত্তি লাভ করা যায় যে কোন উপায়ে এবং অর্থাৎ বর্ণ, জল ইত্যাদি থেকে এবং কায়িক পরিশ্রম অর্থাৎ বাণিজ্য, শিল্প ও চাকরীর মাধ্যমে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় ন্যায়নীতিসঙ্গত নয়। সমগ্র মানব সমাজের হিত এবং মঙ্গলার্থে যে অর্থনীতি তাহাই সংক্ষেপে 'কল্যাণ অর্থনীতি' রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। এই শব্দবন্ধটি অর্বাচীন হলেও মানব কল্যাণ প্রসঙ্গে এটির প্রয়োগ বহু প্রাচীন। যদিও বুদ্ধোপদেশ কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যে এই শব্দবন্ধটির হুবহু উল্লেখ পাওয়া যায় না, তথাপি মানবের পার্থিব হিত ও সুখের জন্য ধর্মোপদেশের মধ্যে কখনো কখনো তিনি অর্থব্যবস্থার স্থিতি এবং উন্নতিকল্পে কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছেন তাঁর ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক-উপাসিকাদের জন্য। অর্থনীতি সংক্রান্ত এই সকল বক্তব্যগুলির মধ্যে তাঁর উপদেশাবলী বিশ্লেষণ করলে 'বৌদ্ধ অর্থনীতি'র আভাস পাওয়া যায়। যেহেতু গৌতম বুদ্ধ সমগ্র জীবনব্যাপী জগতের এবং জগৎবাসীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ভাবিত ছিলেন, সেহেতু অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনাও কল্যাণমূলক ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যাবে 'কল্যাণ অর্থনীতি' এবং 'বৌদ্ধ অর্থনীতি' সমার্থক। একথা অনস্বীকার্য যে বুদ্ধ সরাসরি অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট কোন আলোচনার সূত্রপাত করেননি। কিন্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাঁর উপদেশসমূহে অর্থনৈতিক ভাবনার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, তাঁর চিন্তাভাবনা মানবের কল্যাণার্থে আবর্তিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাও ছিল কল্যাণমূলক। তাই গবেষকবৃন্দ তাঁর অর্থনৈতিক বক্তব্যগুলি একত্রে সংগৃহীত এবং বিশ্লেষণ করে সেগুলিকে 'বৌদ্ধ অর্থনীতি' বা 'কল্যাণ অর্থনীতি'-র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধুনা এই শব্দবন্ধটি রূপান্তরিত করে বলা হয় Welfare Economics যার উদ্দেশ্যও হলো অর্থনীতিকে মানব কল্যাণে প্রয়োগ করা। 'বৌদ্ধ অর্থনীতি' বলে কোন শব্দযুগল বৌদ্ধযুগে ব্যবহৃত হয়নি— একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীতে 'বৌদ্ধ অর্থনীতি' শীর্ষক এই নূতন শব্দবন্ধের প্রচলন হয়। কিন্তু অর্বাচীন এই 'বৌদ্ধ অর্থনীতি' কোন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়বস্তু নয়। শিক্ষা, পরিবেশ, ব্যক্তি এবং সমাজপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এর বিষয়বস্তু অন্যান্য বিষয় শৃঙ্খলার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ মতবাদ চাহিদাপূরণের ক্ষুদ্র এবং সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করে মানবজীবনের বৃহত্তর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক সম্মিলন ঘটিয়েছে। বৌদ্ধ অর্থনীতি মানবহিতার্থে মূল্যবোধ অন্বিত বিচারবুদ্ধি এবং বুদ্ধাদেশিত নৈতিক বিধিবিধান-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। 'দ্বিচক্ষু-সুত্ত'-এ উল্লেখ

আছে। একচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন তিনি যাঁর ধনপ্রাচুর্য এবং কুশল গুণাবলীর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই[২]। বৌদ্ধ ধারণা আরো বিস্তারিত করা হয়েছে 'বড্ডী-সুত্ত'-এ যেখানে কোন ব্যক্তির পার্থিব শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত দশ প্রকার পন্থা বর্ণিত হয়েছে : (১) বাস্তু ও কৃষিজমি সংগ্রহ, (২) ধন ও সম্পত্তি রক্ষা, (৩) স্ত্রী ও সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ, (৪) পরিচারক অনুচর পোষণ, (৫) সাংসারিক গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন, (৬) শ্রদ্ধাশীল হওয়া, (৭) সদগুণসম্পন্ন হওয়া, (৮) লৌকিক বিদ্যালাভ, (৯) উদারতা প্রদর্শন এবং (১০) আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রজ্ঞাবান হওয়া।[২] অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ধর্মোপদেশ এবং নৈতিক অনুশাসন-এর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তববাদী গৌতম বুদ্ধের অনেক দেশনায় তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা ভাবনার সচেতন প্রতিফলন দেখা যায়, যদিও তিনি প্রথমত এক মহান আধ্যাত্মিক গুরু ও শিক্ষক এবং মানসিক ব্যাধির সুনিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে অনেক সময় তিনি বিভিন্ন পার্থিব সমস্যাবলী সমাধান করেছেন একান্ত বাধ্য হয়েই। তাই তাঁকেও মানবকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে এবং সেইমত শিষ্য ও শিষ্যাদের পরামর্শ দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক সমাধানের কথা বলে মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন গৌতম বুদ্ধ।

**কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য**

কল্যাণকর বা বৌদ্ধ অর্থনীতির নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

(১) পারস্পরিক অধীনতা বা নির্ভরতা এবং পারস্পরিক অধিকার ও সুযোগসুবিধা। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যেমন কার্যকারণ এবং তদনুযায়ী ফল বর্তমান থাকে, তেমনি জাগতিক ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক বিষয়ে। 'অগ্গঞ্ঞ-সুত্ত'-এ বিবৃত হয়েছে আদিকালে প্রকৃতির অকৃপণ দানে মানবসমাজ খুব সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু কালক্রমে অধিকাংশ ব্যক্তি লোভী হতে লাগলেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁরা দোষক্রটির অধীন হয়ে পড়লেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির আবির্ভাব ঘটলো।[৩]

(২) কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতি প্রতিযোগিতা এবং শোষণ-এর পরিবর্তে সহযোগিতা এবং মানব কল্যাণমুখী। সেজন্য গৌতম বুদ্ধ সামাজিক বিবাদের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করে বলেছেন : ধনসম্পত্তির সুসম বন্টনের অভাবে দরিদ্রদের মধ্যে দারিদ্র্য ক্রমশঃ প্রকট হয়, ঝগড়া-মারামারির প্রাদুর্ভাব ঘটে, চুরি খুন জখম হিংসা বাড়তে থাকে এবং প্রাণনাশের ঘটনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সমাজে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি সুস্থিত রাখার জন্য ধনসম্পত্তির সমবন্টন প্রয়োজন।[৪]

(৩) কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতি নির্ভর করে অহঙ্কারে লোভ স্বার্থপরতা থেকে মুক্তির উপর। যে কোন উপায়ে ধন সঞ্চয় করা বুদ্ধমতে অকুশল। এভাবে কোন ব্যক্তি যদি ধন সঞ্চয় করতে থাকেন এবং প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করে নিজেই তা ভোগ করতে উদ্যোগী হন, তবে তাঁর ধ্বংস অনিবার্য।

(৪) ব্যবসা-বাণিজ্যে মুনাফা অর্জন করাই কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির একমাত্র মান-নির্ণায়ক নয়। কোন কর্মের দ্বারা যে কোন উপায়ে মুনাফা লাভ করা কোন ব্যবসায়ীর একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। তাঁর চারপাশের ব্যক্তিদের উপর এবং পরিবেশের উপর এই মুনাফার প্রভাব মূল্যায়ন আবশ্যক।

(৫) স্বতঃস্ফূর্ত সরলতা, আত্মসন্তুষ্টি, উদারতা, ঔদার্য, বদান্যতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীকে অতিক্রম করে কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতি। কোন ব্যক্তির মধ্যে এই গুণাবলী উপস্থিতি যথেষ্ট নয়, নিরন্তর অনুশীলনের দ্বারা এগুলি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।[৫]

(৬) কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানিকতা উৎসাহিত করা। স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার দ্বারা স্থানীয় চাহিদাপূরণ হল কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির মূল লক্ষ্য।

(৭) চরম মিতব্যায়িতা এবং পুনরাবর্তন হল কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। একদা বুদ্ধ উদম্বর বৃক্ষ বা ডুমুর গাছ থেকে প্রয়োজনাতিনিরিক্ত ফল আহরণ করতে নিষেধ করেন, কারণ তাতে অপ্রয়োজনীয় ফলসমূহ অনর্থক বিনষ্ট হবে।[৬]

(৮) মানবিক সুখসম্বলিত মধ্যমানের কারিগরীবিদ্যার প্রয়োগ কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতি উৎসাহিত করে। বৌদ্ধ শিল্পনীতি অনুসারে মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার কাম্য। কারণ এই সকল শিল্পোদ্যোগের দ্বারা বেকারীত্ব বহুলাংশে দূর করে সমাজে অস্থিরতা কমাতে সাহায্য করে। বস্তুতঃ বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে মানুষকে যন্ত্রমানবে পরিণত করে এবং স্বাভাবিক মানুষকে ক্রমশঃ অমানুষে পরিণত করে।

(৯) কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক সমদর্শিতা প্রদর্শন এবং সম্যক জীবিকা অবলম্বন। এক ধার্মিক ব্যক্তির উদ্দেশ্যই হলো ন্যায়পরায়ণ হওয়া, সম আচরণ করা ('ধম্মচরিয় সমচারিয়'),[৭] মধ্যম পন্থার অঙ্গ স্বরূপ সম্যক জীবিকার দ্বারা জীবিকানির্বাহ করা, অপরের প্রতি করুণা প্রদর্শন[৮], প্রয়োজন বিষয়ে সংযত থাকা এবং সর্বপ্রকার লোভ সংবরণ করা ('বিসমলোভ')[৯]।

(১০) প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাভাব পোষণ করা কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির অবশ্য কর্তব্য। বৌদ্ধ মূল্যবোধ জাগ্রত করে জনগণের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হল নিরন্তর বৃক্ষ রোপণে রত থাকা এবং বৃক্ষচ্ছেদন থেকে বিরত থাকা। বৌদ্ধ অর্থনীতিবিদ-এর ধারণা এই সকল নিয়মাবলী সর্বতোভাবে

পালন করলে বিদেশী সাহায্য ছাড়াই যে কোন দেশ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জ্জন এবং উন্নতি করতে পারে।

(১১) কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতি অনুসারে পণ্য নয় মানুষই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সচেতনভাবে ভারী যন্ত্রের ব্যবহার দ্বারা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সফল মোকাবিলার মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং অজ্ঞাত বাধ্যবাধকতার বিপরীতে জনগণের, ব্যক্তি সাধারণের, পরিবারের এবং ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রকৃত মঙ্গল সাধন সম্ভব।

(১২) যন্ত্রাদির সাহায্যে বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের পরিবর্তে জনগণের স্বার্থে উৎপাদনই হলো কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য। বৃহৎ শিল্পোৎপাদনে উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোম কাম্য ও বাঞ্ছনীয়।

(১৩) কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির গুরুত্ব দৈনন্দিন জাগতিক চাহিদা থেকে পরিবর্তিত হয়েছে মানবের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ 'মধ্যম পন্থার' মাধ্যমে এই পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব।

(১৪) কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির অভিমুখ মুখ্যতঃ ধাবিত হয়েছে মানবচরিত্রের শুদ্ধতার প্রতি। আধুনিক বস্তুবাদ-এর গুরুত্ব হ্রাস করে বিশুদ্ধ মানবচরিত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই অর্থনীতিতে।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণ অর্থনীতি থেকে কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতিকে পৃথক করেছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে মুনাফাই প্রথম ও শেষ কথা, অন্যদিকে শেষোক্তিটিতে মানব এবং মানবজাতির কল্যাণ সাধনই মুখ্য ও একমাত্র বিষয়।

**মানবজীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা**

প্রাচীনকাল থেকে যদিও অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তবুও মানবজীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি, যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং ঔষধ, একইরকম থেকে গেছে। এই প্রয়োজনগুলির মধ্যে একটিরও অভাব দেখা গেলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। তাই আধুনিক অর্থনীতিবিদরাও মনে করেন এই চারটি মৌল চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা যেন ধারাবাহিকভাবে অবিচ্ছিন্ন থাকে। গৌতম বুদ্ধ নিজে 'বিনয়' উপদেশে ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের এ বিষয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্ঘজীবনে যেমন এগুলি মহত্বপূর্ণ, সমাজ জীবনেও এগুলির গুরুত্ব সবিশেষ অনুভূত হয়। সঙ্ঘজীবনের ক্ষেত্রে বুদ্ধ দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, এই চারটি উপাদানই সমগ্র ভিক্ষু সংঘের সম্মিলিত সম্পত্তি এবং উপাসক উপাসিকাদের থেকে প্রাপ্ত দানীয় সামগ্রী ও নগদ অর্থসমেত সবই সঙ্ঘসম্পত্তিরূপে বিবেচিত হবে। সম্মিলিত সঙ্ঘসম্পত্তির এই ধারণাই পরবর্তীকালে সমবায় প্রথার প্রচলন করেছে। এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

## কল্যাণ অর্থনীতি এবং বৌদ্ধ শীল বা সদাচার পালন

সাধারণ গৃহস্থদের প্রতি 'মহামঙ্গল' বা 'মঙ্গল সুত্ত'-এ গৌতম বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলি মূলতঃ শীল বা সদাচার বা নৈতিক বিধানসংক্রান্ত হলেও তাতে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রতিবিম্বন রয়েছে।

ধমোপর্জ্জনের জন্য বৃত্তি বিষয়ে তিনি বলেছেন :

নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা, বিবিধ শিল্পশিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া... (গাথা ৪) এবং ... নিষ্পাপ ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাই (গাথা) উত্তম মঙ্গল।

সৎভাবে অর্জ্জিত ধনসম্পত্তির ব্যয় প্রসঙ্গ তাঁর উপদেশ :

মাতা-পিতার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রের উপকার করা... (গাথা-৫), দান দেওয়া,... জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধন করা (গাথা-৬), এবং কায়িক ও মানসিক পাপে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপে বিরতি, মদ্যপানে সংযত হওয়া (গাথা-৭)।

এসকল উপদেশে বুদ্ধ ধন উপার্জ্জনের জন্য কেবল শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা সৎ জীবনযাপনে পরামর্শ দিয়েছেন তা নয়, সেভাবে উপার্জিত ধনসম্পত্তি সম্যকরূপে ব্যয় করারও পথনির্দেশ করে মাতা পিতা, স্ত্রী-পুত্র-এর ভরণপোষণ ও আত্মীয়স্বজনকে আর্থিক সাহায্য করে কায়িক বাচনিক ও মানসিক শুদ্ধাচারে জীবন অতিবাহিত করার কথা তিনি বলেছেন। সমাজ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, সেজন্য গৃহীদের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে মদপান বর্জ্জনের উপদেশ না দিয়ে তিনি বললেন 'মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো'—মদ্যপানে সংযম রক্ষা করতে। এতে তাঁর বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়[১০]।

বুদ্ধোপদেশিত 'শীল'-এর উল্লেখ রয়েছে—'পরাভব-সুত্তটি'তেও। ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক উদম্যহীনতা যে অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায় সে বিষয় এই 'সুত্ত'-এ বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি গমনে উপবেশনে ও শয়নে নিদ্রালু, অন্যের সঙ্গে গল্প করে সময় অতিবাহিত করেন, উদ্যমবিহীন, আলস্যপরায়ণ ও ক্রোধী (গাথা-৭), সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিগত যৌবন জরাজীর্ণ মাতাপিতার ভরণপোষণ করেন না (গাথা-৯), স্বর্ণরৌপ্য ও মুদ্রাদি প্রভূত সম্পত্তি থাকলেও কাউকে তা দেন না, অন্যের দেওয়া সুস্বাদু খাদ্যভোজ্য নিজে একাকী গোপনে পরিভোগ করেন (গাথা-১৩), জাত্যাভিমানী ধনাভিমানী গোত্রাভিমানী, স্বীয় জ্ঞাতিদের দরিদ্র বলে অবজ্ঞা করেন (গাথা ১৫), স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত পর-স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, সুরাপায়ী, জুয়ারী ও অক্ষক্রীড়াসক্ত (গাথা-১৭), স্বীয় স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট, বেশ্যাসক্ত, পর স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত (গাথা-১৯), বার্ধক্যে বিবাহিত তরুণী ভার্যাকে পর পুরুষের সঙ্গে সহবাস করতে দেখে ঈর্ষানলে দগ্ধ হয়ে নিদ্রাহীন হওয়া (গাথা ২১), মৎস্য মাংস মদ্য ও খাদ্যভোজ্যাদির জন্য নিরর্থক অর্থব্যয়কারিণী স্ত্রীকে অথবা সেরূপ সম্পদ বিনাশকারী পুরুষকে যে উত্তরাধিকারী নিয়োগ বা বাণিজ্যকর্মের ভার অর্পণের দ্বারা ধনহানির ব্যবস্থা করা (গাথা-২৩), এজন্যই তিনি

অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে পরাজিত[১১]। এই অনুশাসনগুলি 'বৌদ্ধ অর্থনীতি' সংশ্লিষ্ট। 'বসল-সুত্ত'টিতেও যে ব্যক্তি দানকার্যাদিতে অবিশ্বাসী (গাথা-২), গ্রামে বা অরণ্যে অপরের অধিকারভুক্ত ধন চুরি করে (গাথা-৫), ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ না করার ইচ্ছায় গোপনে পলায়ন করে (গাথা-৬), বিষয় সম্পদ লাভের ইচ্ছায় পথিকদের কিঞ্চিৎ মাত্র দ্রব্যও ছিনতাই করে (গাথা ৭), কিছু জিজ্ঞাসিত হয়ে নিজের স্বার্থে বা পরের স্বার্থে বা ধন লাভের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় (গাথা ৮), নিজের প্রভূত ধন সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও বিগত যৌবন বৃদ্ধ মাতাপিতার ভরণপোষণ নির্বাহ করে না (গাথা ১০), পরগৃহে গিয়ে উত্তর ভোজন গ্রহণ করে, কিন্তু নিজ গৃহে সেই ব্যক্তিকে প্রতিদান দেয় না (গাথা ১৪), কৃপণ (গাথা ১৯) সেই প্রকৃত অর্থে বসল বা বৃষল।[১২] এই 'সুত্ত'-এ বুদ্ধ অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে সঙ্গে 'শীল' বা নৈতিক ধর্ম্ম পালনের উপর জোর দিয়েছেন এবং বারবার তিনি বৃদ্ধ মাতাপিতার ভরণপোষণের ভার বহন করতে নির্দেশ দিয়ে বললেন তাতে ধনসম্পত্তির অপচয় হয় না, বরং সদ্ব্যবহার হয়। বৌদ্ধ অর্থনীতি সঙ্গতকারণেই একান্তভাবে শীল-নির্ভর। নৈতিক বিধিবিধান বহির্ভূত অর্থনীতি দেশ সমাজ ও ব্যক্তির পক্ষে অমঙ্গলজনক এবং সেজন্য অকাম্য।

'কল্যাণ অর্থনীতি' এবং 'মজ্ঝিমা পটিপদা' বা 'মধ্যম পন্থা' উল্লেখ প্রসঙ্গে সম্যক জীবিকা ব্যাখ্যা করে হীন বিদ্যা অবলম্বন করে কতোগুলি মিথ্যা জীবিকার দ্বারা জীবন ধারণ না করার পরামর্শ দিয়েছেন। 'ব্রহ্মজাল-সুত্ত' এবং সামঞ্ঞফল-সুত্ত'-এ[১৩] 'সম্যক জীবিকা' দ্বারা মদ্য, মাংস, বিষ, মাদক ও নেশাদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় থেকে তিনি বিরত থাকতে বলেছেন। অবশ্য আধুনিক অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা, ভোগ্যপণ্য ব্যবহার ও সরবরাহ ব্যবস্থা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। যে কোন ভোগ্য পণ্য ব্যবহারের অকুশল প্রতিক্রিয়া অকিঞ্চিৎকর পরিগণিত হয় রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। ফলে বাস্তবক্ষেত্রে মাদক ইত্যাদি নেশা উদ্রেককারী বস্তু এবং অস্ত্র বিক্রয়ের কুফল আধুনিক সমাজে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ অস্ত্র-বাণিজ্য বিশ্বশান্তির পক্ষে বিশেষ হানিকর হচ্ছে। সম্প্রতি E. F. Schumacher দেখিয়েছেন বুদ্ধের উপদেশ বিশেষ করে সম্যক জীবিকা সম্বন্ধে তাঁর দেশনা, আধুনিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে কতোটা সুফলপ্রদায়ক। বুদ্ধ ধন লাভ এবং আমোদপ্রমোদের চেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন সৎ জীবনযাপনের উপর। খোলা বাজারে অকুশল দ্রব্যের রমরমা বাণিজ্য সমৃদ্ধ অর্থনীতির পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন মানবজীবনে তা এক মহাপ্রলয় সৃষ্টি করবে।[১৪] বাস্তব ক্ষেত্রে 'মজ্ঝিমা পটিপদা' বা 'মধ্যম পন্থা' অর্থনীতির প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে এই শব্দ যুগলের দ্বারা 'ওয়েলথ' বা ধনসম্পদকে আরো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মূল্যায়নের মাধ্যমে জনগণের হিতসাধনমূলক কর্মে ব্যয় করা যায়। তাই Johan Galletunga মন্তব্য করেছেন : 'বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যম মার্গ হলো ঘরের ছাদ

ও মেঝের মধ্যস্থ স্থানসদৃশ। এই (দার্শনিক মতবাদ) কেবল হিন্দু সমাজে (দৃষ্ট) অপরিমিত ধনদৌলত সঞ্চয়ের পরিপন্থী নয়, (দারিদ্রজনিত) দুঃখ কষ্ট, এমন কি চরম কৃচ্ছ্রতাজনিত স্বেচ্ছাসৃষ্ট শরীর পীড়নেরও প্রতিবন্ধক।[১৫] বৌদ্ধ নৈতিক বিধান বা শীলগুলি অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি আরো লিখলেন : "শীল পালনের দ্বারা বৌদ্ধ জীবন যাপনের (প্রকৃত অর্থ) সীমাহীন দারিদ্র্য অথবা (প্রচুর) ধনসম্পত্তি (কিংবা) অবাধ হিংস্রতা এমনকি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অপরাধ-এর অবিদ্যামানতা[১৬]। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক সঙ্কোচনকারিতা বিষয়ে অবগত হয়ে বুদ্ধ মনে করিয়ে দিয়েছিলেন : (ক) এই পৃথিবীতে কামভোগী গৃহস্থদের জন্য দারিদ্র্য দুঃখকর"[১৭] 'দলিদ্দিয়ং ভিকখবে দুক্খং লোকস্মিং গিরিনো কামভোগিনো' এবং "এই পৃথিবীতে দারিদ্র্য এবং ঋণ দুঃখপূর্ণ"[১৮]। এতৎসত্ত্বেও তিনি দারিদ্র্যকে কখনো মহিমান্বিত অথবা দারিদ্র্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নি এবং সেই সুদূর অতীতেও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দারিদ্র্য হলো এক সামাজিক ব্যাধি বা অভিশাপ যা দূর করা যেতে পারে কল্যাণ বা মঙ্গলকর অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগের দ্বারা। বুদ্ধের অভিমত, অন্য যে কোন বিষয়ের মতো দারিদ্র্য ও ব্যক্তিগত এবং সমাজগতভাবে ক্ষণস্থায়ী। মহামানব বুদ্ধ নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র, ধনপ্রাচুর্য ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করে ব্যথিত হন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই অসাম্য দূর করার জন্য নানা উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং দেখলেন, এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে মানুষ মাত্রকেই দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হতে হয়, কালক্রমে বৃদ্ধ হতে হয় এবং পরিশেষে রোগ কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করতে হয়, কখনো কখনো চরম নির্ধনতার মধ্যে যখন চারিদিকে চলছে ভোগ্য পণ্যের অপচয়। সেজন্য তিনি জনগণকে বারবার মিতব্যায়ী ও দারিদ্র্যের প্রতি দয়াপরবশ ও সহানুভূতিশীল হতে এবং মানবকল্যাণে ধনসম্পদ বন্টনে উৎসাহিত করেছেন। সমগ্র মানবজাতির উন্নতিকল্পে তিনি ব্যাধি বার্ধক্য অকাল ও অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু বিলম্বিত করতে উপদেশ দেন। তাঁর সমুন্নত ব্যক্তিত্ব মানবকে শিখিয়েছে কিভাবে সামাজিক মধ্যস্থতায় সৎ জীবনযাপন ও সৎ কর্ম দ্বারা পার্থিব যত বঞ্চনা, দারিদ্র্য এবং অভাব দূরে রাখা যায়। পরিভাষাগতভাবে বুদ্ধ অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। একথা ঠিক, কিন্তু একজন দক্ষ অর্থনীতিকের ন্যায় সমৃদ্ধির সময়েও অর্থকৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করতে তিনি বলেছেন যাতে দুর্দিনে কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয়। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ধনসম্পদ সংগ্রহ ও ব্যয়ের ব্যাপারে সকলকে তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর এই সকল অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনাই পরবর্তীকালে কল্যাণকর বা মঙ্গলকর অর্থনীতির ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ধনসম্পদ দানে দারিদ্র্য একেবারে দূর করা না গেলেও কিছুটা দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব। জনগণকে দান-সহায়তায় উৎসাহ দানের মাধ্যমে তিনি যে কোন সৎ পেশায় নিযুক্ত থেকে উপার্জনের দ্বারা সাংসারিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে বলেছেন। কল্যাণ বা হিতকর অর্থনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি তিনি জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন সম্পূর্ণ

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এই সিদ্ধান্তগুলিই বিংশ শতাব্দীতে চিহ্নিত হয়েছে Welfare Economics বা কল্যাণকর বা 'মঙ্গলকর অর্থনীতি' যার উপর গবেষণার জন্য ১৯৯৮ সালে বাঙালি অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রভূত তথ্য-বিস্ফোরণ এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অলৌকিক অগ্রগতিতে আধুনিক যুগে বিশ্ব একটি গ্রামে না প্রকৃতপক্ষে দুটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। একটি গ্রাম হলো ধনবানদের, অপরটি দরিদ্রদের। কিন্তু বুদ্ধদেশিত 'মজ্ঝিমা পটিপদা'-র মাধ্যমে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি যেগুলি কল্যাণকর বা 'মঙ্গলকর অর্থনীতি'র অঙ্গ-ধনী ও দরিদ্র গ্রামদ্বয়ের মধ্যে ধনবৈষম্য হ্রাসে সাহায্য করবে এবং শোষণ, দারিদ্র্য, দুঃখকষ্ট ও অনাহারমুক্ত একটি অখণ্ড বিশ্বগ্রাম স্থাপনে সহায়ক হবে। মানবসম্পদের উন্নতিকল্পে শিক্ষা, দক্ষতা ও সততার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বর্তমানে সুপ্রযুক্ত কল্যাণকর বা 'মঙ্গলকর অর্থনীতি' শব্দবন্ধ ব্যবহার না করেও গৌতম বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বহুজনের হিতের জন্য বহুজনের মঙ্গলের জন্য উত্তর আধুনিক ব্যক্তির ন্যায় 'কল্যাণ' বা 'মঙ্গলকর অর্থনীতি'র সিদ্ধান্তগুলি শুনিয়েছিলেন। তাই তাঁর অমূল্য বাণীসমূহ আজও সম্পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক।

**সম্পদ সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং ক্ষয় সাধন**

আধুনিক অর্থনীতির সূত্রের ন্যায় 'ব্যাগঘপজ্জ-সুত্ত'-এ চারটি বিষয়ে সজাগ থেকে ধনসম্পদ সংগ্রহ ও সাশ্রয়-এর প্রসঙ্গ বুদ্ধ আলোচনা করেছেন কালিয়গৃহস্থ ব্যাগঘপজ্জ-এর সঙ্গে। এই চারটি বিষয় হলো :

(ক) উৎসাহ, (খ) সংরক্ষণ, (গ) সৎ ব্যক্তির সংস্রব, এবং (ঘ) শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। এই চারটি বিষয়কে সামগ্রিকভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, প্রথমটি অর্থাৎ 'উৎসাহ' হলো ধনসম্পদ সংগ্রহের ব্যাপারে প্রযোজ্য এবং শেষোক্ত তিনটির দ্বারা ধনসম্পদ-এর সংরক্ষণ ও সাশ্রয় সম্ভব। অর্থনীতিশাস্ত্র অনুসারে ধন যেমন আয় করতে হয়, তেমনি ব্যয়ের ব্যাপারেও বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।' উৎসাহ শব্দটি ব্যাখ্যা করে বুদ্ধ বলেছেন : কৃষি-বাণিজ্য, গোপালন, সৈনিকের কার্য, রাজকর্ম বা যে কার্যের দ্বারা জীবনযাপন করতে হয় সেই কর্মে দক্ষ পরিশ্রমী ও উপায়কুশল হওয়া উচিত এবং যে কাজ যে প্রণালীতে সম্পাদন করতে হয়, সে কাজ সে প্রণালীতে সম্পন্ন করা হল কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন। একেই উন্নত গার্হস্থ্যজীবন যাপনের 'উৎসাহ' বলা হয়। লক্ষণীয়, এই অংশে ধনসম্পদ আহরণের বিভিন্ন বৃত্তি এবং স্ব স্ব বৃত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধানের দ্বারা সুষ্ঠু ও নৈতিকভাবে অর্থ আয়ের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিতেও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে এভাবে ধনসম্পদ সংগ্রহের নিদান রয়েছে। 'সংরক্ষণ'-এর ব্যাখ্যা করে উপমার দ্বারা ধনসম্পদ রক্ষা বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। একজন ধনশালী ব্যক্তি স্বীয় উদ্যম ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে শ্রমলব্ধ সেই ধনসম্পদ

কিভাবে সুরক্ষিত থাকে, অন্যায়ভাবে কেউ অধিকার করতে না পারে, চোর কর্তৃক অপহৃত কিংবা অগ্নি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, জল দ্বারা বিনষ্ট এবং ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থেকে স্বীয় ধনসম্পত্তি রক্ষায় সচেষ্ট থাকা উচিত। এই মানসিকতাই 'সংরক্ষণ' চিন্তার জন্ম দেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়-ধনসম্পদ রক্ষার ব্যাপারে 'সংরক্ষণ' এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। সৎ ব্যক্তির সংস্রব'-এর দ্বারাও কষ্টার্জিত ধনসম্পদ রক্ষা করা যায়, কারণ সৎ শ্রদ্ধাবান শীলবান ও জ্ঞানী লোকের সংস্পর্শে এসে ধনবান ব্যক্তিও অনুরূপ গুণাবলীর অধিকারী ও কুশলকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে সকল অকুশল কর্ম পরিহার করে বিবেচক গৃহস্থরূপে নিজস্ব ধনসম্পত্তি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে তত্ত্বাবধান করবেন। 'শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন' যাপনের দ্বারা গৃহী আয়-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে কৃপণ কিংবা অমিতব্যয়ী হবেন না, পরন্তু মিতব্যয়ী হয়ে প্রয়োজনানুসারে তিনি ব্যয় করবেন এবং সর্বক্ষণ তৎপর থাকবেন ব্যয়ের চেয়ে বেশী আয় ও অর্থসঞ্চয় যাতে হয়।[১৯] কিন্তু অতিরিক্ত আয় করেও দানে কৃপণতা প্রদর্শন যুক্তিবাদী ব্যক্তির পক্ষে হিতকর নয়। কারণ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি কিংবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির নিকট ধনপ্রাচুর্য থাকবে, অন্যদিকে অধিকাংশ লোক অনাহার, বাসস্থানহীন, বস্ত্রহীন ও চিকিৎসাহীনভাবে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করবে এই ব্যবস্থা যেমন নৈতিকভাবে কাম্য নয়, তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকে বাঞ্ছনীয় নয়। ধনবন্টনে এরকম অসাম্য চলতে থাকলে সমাজে এবং দেশে অরাজকতা ও শাসন ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেবে। সেজন্য সুষম ধনবন্টনের একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে বুদ্ধ যেন আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের থেকে চিন্তার ক্ষেত্রে বেশ কয়েক বছর এগিয়েছিলেন। সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থাকল্পেও উপরোক্ত চারটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই চারটি বিষয় কল্যাণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য এবং তাই এখনও এগুলি প্রাসঙ্গিক।

কি কি কারণে ধনসম্পদ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে সে সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যায় 'সিঙ্গালোবাদ সুত্ত-এ। কারণগুলি হলো : ধার্মিক গৃহস্থের (১) মত্ততাজনক নেশাদ্রব্য সেবন, (২) অসময়ে পথেঘাটে বিচরণ, (৩) নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ, (৪) দূত্যক্রীড়ায় অর্থাৎ পাশা তাস ইত্যাদির প্রতি অনুরক্ত, (৫) পাপমিত্র সংসর্গ, এবং (৬) আলস্যপরায়ণতা। এই ছয় প্রকার কুঅভ্যাস ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—নেশাদ্রব্য সেবন করার ফলে ধনহানি, কলহবৃদ্ধি, বিবিধ রোগের সৃষ্টি, দুর্নাম প্রচার, ক্রোধসঞ্চার, হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতার সম্ভাবনা, অসময়ে পথেঘাটে বিচরণের ফলে স্বীয় কায়, স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়সম্পত্তি অগুপ্ত অরক্ষিত থাকে, সর্বদা শঙ্কিত চিত্তে বিচরণ করতে হয়, পাপঘটনায় মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত ও আরো অন্যান্য অনেকপ্রকার দুঃখজনক ব্যাপারের হেতু হয়, সর্বদা নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করলে কোথায় নৃত্য সঙ্গীত বাদ্য নাটক পাণিস্বর বা কাংস্যতাল ও পাণিস্বরযুক্ত 'অস্মতাল' হবে ইত্যাদি বিষয়ে সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়, দূত্য ক্রীড়াসক্ত হলে জয়লাভে শত্রুতা বৃদ্ধি, পরাজয়ে

অনুশোচনা, প্রত্যক্ষভাবে ধনহানি, ন্যায়ালয়ে অভিযোগ অগ্রহণ, আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত, আবাহ-বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপনে অপারগ ও স্ত্রীর বসনভূষণাদি সরবরাহ করতে অক্ষম হয়, ধূর্ত, চরিত্রহীন, নেশাপায়ী, জুয়াখোর, প্রবঞ্চক ও দুঃসাহসিক লোকেরাই পাপমিত্র সহবাসকারীর মিত্র ও সহায়ক; আলস্যপরায়ন ব্যক্তি অতিরিক্ত শীত, অতিরিক্ত গ্রীষ্ম, অতি সকাল, প্রখর মধ্যাহ্ন, নিঃঝুম রাত্রি বিবেচনায় নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন না করায় অবহেলার ফলে অনেক কর্মই অসম্পূর্ণ থাকে। ফলে সেই ব্যক্তি নূতন কোন ধনসম্পত্তি আহরণ করতে পারে না, উপরন্তু যে ধনসম্পত্তি রয়েছে তা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়[২০]। ধন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে বুদ্ধ সিঙ্গালক গৃহপতিপুত্রকে চার শ্রেণীর লোককে মিত্রবেশী শত্রুরূপে বর্ণনা করে পরস্বাপহারক প্রসঙ্গে বললেন মিত্রবেশী শত্রু পরস্বাপরক সর্বদা অন্য ব্যক্তির ধনসম্পত্তি হরণ করে, অন্যকে স্বল্পমাত্র দান করে ও তৎপরিবর্তে অনেক বেশী প্রত্যাশা করে, সব সময় ভয়ে ভয়ে কাজ করে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়। সেজন্য বুদ্ধ এরকম ব্যক্তিদের থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে বলেছেন।

**কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ**

যে দেশে যতো বেশি দারিদ্র্য থাকবে, সেখানে ততো বেশী চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, জখম, হত্যা ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটবে। তাই আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান এবং অর্থশাস্ত্রের বিচারে রাষ্ট্রমধ্যে এই অরাজক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রচুর কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বুদ্ধোপদেশ 'কূটদন্ত-সুত্ত'-এ বিবৃত হয়েছে কোন অসাধু ব্যক্তিকে ডাকাতি, লুটতরাজ, হত্যা, হয়রানি প্রভৃতি অপকর্ম থেকে বিরত করা যাবে না কারাদণ্ড, জরিমানা কিংবা মৃত্যুদণ্ড দ্বারা।চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য অনিয়মগুলি দূর করে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক :

(১) কৃষি কর্মে সহায়তার জন্য কৃষকদের ধান্যবীজ বিনামূল্যে বিতরণ, (২) মূলধন সরবরাহ করে যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে ইচ্ছুক তাঁদের সাহায্য করা, (৩) যাঁরা সরকারী কার্যে ইচ্ছুক তাঁদের যথাযোগ্য বেতন প্রদানের মাধ্যমে বেকারিত্ব দূরীকরণে উদ্যোগ। যদি প্রতিটি ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চাকরীতে নিযুক্ত থাকেন তবে দেশে সুখ এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। সরকারী রাজকোষ করদাতাদের দেয় অর্থে পরিপূর্ণ হবে। জনগণ শান্তিতে রাষ্ট্রমধ্যে বসবাস করতে পারবেন[২১], গৌতম বুদ্ধ জানালেন, পশু হত্যার দ্বারা যজ্ঞ অনৈতিক। তিনি যজ্ঞ প্রসঙ্গে প্রাচীনকালের রাজা মহাবিজিত-এর যজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। রাজা তাঁর ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা প্রথমেই তাঁর রাজ্য থেকে দারিদ্র্য দূর করতে উপদেশিত হলেন, কারণ ধনসম্পদের প্রাচুর্যই সর্বপ্রকার কলুষতা, চৌর্য এবং অন্যান্য অকুশল কর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। রাজাকে আশ্বস্ত করা হলো যাতে তিনি

বিচলিত না হোন দারিদ্র্য দূর করতে তাঁর যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে তার জন্য অথবা অনেক অযোগ্য ব্যক্তি এই সুযোগ গ্রহণ করবে বলে অথবা জনগণ থেকে এ ব্যাপারে কঠোর সমালোচনা হবে বলে। তাঁর এই দানযজ্ঞে কোন গরু, ছাগল, মুরগী কিংবা শূকর বলি হবে না অথবা এ ব্যাপারে তাঁর ভৃত্যদের অযথা হয়রান হতে বা শাস্তি পেতে হবে না। এটাই হলো আদর্শ যজ্ঞ। বুদ্ধ জানালেন, এর চেয়ে মহৎ যজ্ঞ হলো যদি যাঁরা প্রকৃতপক্ষে অভাবগ্রস্ত তাঁদের জন্য সর্বত্র দানছত্র খুলে দান দেওয়া হয়। বুদ্ধ 'চক্কবত্তি সীহনাদ-সুত্ত'-এ জোর দিয়ে বললেন, রাজার প্রধান কর্তব্য হলো, যাঁরা দরিদ্র তাঁদের জন্য কর্মসংস্থান করা যাতে তাঁরা পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথাযথ আয় করতে পারেন। যদি রাজা তাঁদের জন্য যথাযোগ্য কর্মসংস্থান করতে না পারেন তবে রাজ্যে দারিদ্র্য, ডাকাতি, লুটতরাজ, হত্যা, হয়রানি, চরম বিশৃঙ্খলা বেড়ে এক অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।[২২] এই পরিস্থিতি কল্যাণকামী কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সুখকর নয়। সুতরাং দেখা যায়, রাষ্ট্রের উন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দারিদ্র্য। অতএব কল্যাণ অর্থনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হল কর্মক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান করে দারিদ্র্য দূর করা।[২৩]

**মন্তব্য**

কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হলো কল্যাণ অথবা কল্যাণমুখী অর্থনীতির প্রবর্তন ও প্রচলন। এই অর্থনীতির দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদকে জগতের মঙ্গল কামনায় সৎভাবে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করে মানবের সর্বোতমুখী কল্যাণ সাধিত হয়। কল্যাণ অর্থনীতি বা বৌদ্ধ অর্থনীতি মানব কল্যাণার্থে যথাযথ উপায়ে প্রকৃতি সংরক্ষণই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। সৎভাবে ধনসম্পদ সংগ্রহ এবং সুচারুরূপে তার বন্টন, সুষ্ঠুভাবে কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মিতব্যয়িতা, সঞ্চয়বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, কৃষির উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র শিল্পে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি কর্মের দ্বারা অর্থনীতিকে যথার্থ জনমুখী ও মঙ্গলময় করা আবশ্যক। আক্ষরিক অর্থে বৌদ্ধ অর্থনীতির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মানবকল্যাণের অর্থনৈতিক যোজনাবলীই প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করবে। কিন্তু দেখতে হবে, এই সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলে বুদ্ধদেশিত সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম, সৎ জীবিকা বাস্তবায়িত হয়। বৌদ্ধ আদর্শের উপর একান্ত নির্ভরশীল এই কল্যাণ বা বৌদ্ধ অর্থনীতিই পারবে সমাজ এবং রাষ্ট্র-এ সুস্থিতি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করতে।

**পাঠ সংকেত**

১। 'অঙ্গুত্তর-নিকায়', ১ম খণ্ড, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ১২৮।
২। 'অঙ্গুত্তর-নিকায়', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭
৩। 'দীঘ-নিকায়' ৩য় খণ্ড, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ৮০-৯৮।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।
৫। 'সুত্তনিপাত', লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ১৮৭।
৬। 'সংযুক্ত-নিকায়', ৪র্থ খণ্ড, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃ. ২৮৩।
৭। 'মজ্ঝিম-নিকায়', ১ম খণ্ড, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ২৮৯।
৮। 'সুত্তনিপাত', ৫-৭৩।
৯। 'দীঘ-নিকায়' ৩য় খণ্ড, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃ ৭৩।
১০। 'খুদ্দকপাঠ' সম্পা. এইচ. স্মিথ, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, ১৯১৫।
১১। 'অঙ্গুত্তর-নিকায়', ৪র্থ খণ্ড, সম্পা. ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ, নালন্দা, পালি পাবলিকেশান বোর্ড, ১৯৬০, পৃঃ ১৫১-২৬৯।
১২। 'সুত্তনিপাত', 'উরগ-বগ্গ', সম্পা. ডি. অ্যাণ্ডারসন এবং এইচ স্মিথ।
১৩। দীঘ-নিকায়', ১ম খণ্ড, সম্পা. ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ, নালন্দা, পালি পাবলিকেশান বোর্ড, ১৯৫৮, পৃঃ ৩-৫।
১৪। Schumacher, E. F. *Small is Beautiful : Economics as if People Mattered.*
১৫। Galletunga, Johan, *Buddhism : A Quest for Unity and Peace.* Rathamalana, 1993, p. 41.
১৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২-৩৩।
১৭। 'অঙ্গুত্তর-নিকায়' ৩য় খণ্ড, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ৩৫৩।
১৮। 'প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫২।
১৯। 'মনোরথপূরণী' ২য় খণ্ড, এম. ওয়ালেসার এবং এইচ. কোপ, লণ্ডন, পালি টেক্সট সোসাইটি, ১৯৩৩, পৃঃ ৫৫৮, ৭৭৮।
২০। 'দীঘ নিকায়', ৩য় খণ্ড, নালন্দা, পালি পাবলিকেশান বোর্ড, পৃঃ ১৩৯-১৪৯।
২১। 'দীঘ-নিকায়', ১ম খণ্ড, নালন্দা, পালি পাবলিকেশন বোর্ড, পৃঃ ১০৯-১২১।
২২। 'দীঘ-নিকায়', ৩য় খণ্ড। নালন্দা, পালি পাবলিকেশান বোর্ড, পৃঃ ৪৬-৬২।
২৩। Barua, Dipak Kumar, *An Analytical Study of Four Nikayas.* Calcutta, Rabindra Bharati University, 1971, PP. 419-423.

চতুর্থ অধ্যায়

# স্বেচ্ছামৃত্যু

## সংজ্ঞা

ব্যাপক অর্থে 'স্বেচ্ছামৃত্যু' অথবা 'স্ব ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ' হলো 'আত্মহনন' বা 'আত্মহত্যা'-র একটি প্রতিশব্দ। কিন্তু এক বিশেষ অর্থে 'স্বেচ্ছামৃত্যু' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিশেষ অর্থ হলো 'চিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসাতীত রোগীর মৃত্যু'। গ্রীক ভাষায় দুটি শব্দ, যেমন, Eu এবং Thanatos শব্দদ্বয়ের মিলিত রূপ হলো Euthanasia. অথবা 'ইউছেনেসিয়া বা চিকিৎসকের সাহায্যে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করা। ব্যক্তির 'মৃত্যুর অধিকার' দিতে বিভিন্ন দেশে এরূপ 'মহৎ মৃত্যু' বা 'মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু' বা 'চিকিৎসাতীত রোগীর বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু সঙ্ঘটন' অনুমোদন লাভ করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমাগত অসুস্থ থেকে অসুস্থতর হতে হতে একসময় ঐ অসুস্থ ব্যক্তি অথবা তাঁর আত্মীয়স্বজন আইনানুগভাবে চিকিৎসকের সহায়তায় ঐ ব্যক্তির মৃত্যুতে সম্মতি প্রদান করেন। অসুস্থতার জন্য ঐ ব্যক্তির নিকট জীবন দুর্বিষহ ও অসহনীয় হয় এবং তিনি মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণ ত্যাগে উদ্যোগী হন। কিন্তু যেহেতু এ প্রকার স্বেচ্ছামৃত্যু অনেক দেশে আইনানুগ নয়, সেজন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় পরিশেষে।

## স্বেচ্ছামৃত্যুর প্রকারভেদ

চিকিৎসাতীত যন্ত্রণাহীন স্বেচ্ছামৃত্যু বিভিন্ন প্রকার। যেহেতু ইউথেনেসিয়ার মুখ্য বিষয় হলো চিকিৎসকের সাহায্যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ কিংবা চিকিৎসার দ্বারা হত্যা করা, সেজন্য আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ 'ইউথেনেসিয়া'-র প্রকৃত অর্থ হলো চিকিৎসার দ্বারা অভিপ্রেত বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চিকিৎসাতীত কোন অসুস্থ ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট করা। ইউথেনেসিয়া বা চিকিৎসাতীত যন্ত্রণাহীন রোগীর স্বেচ্ছামৃত্যু ব্যবস্থার চারটি উপাদান রয়েছে, যথা—(ক) রোগী, (খ) রোগীর আত্মীয়স্বজন, (গ) চিকিৎসক, (ঘ) মৃত্যু সঙ্ঘটন প্রক্রিয়া। জ্ঞান থাকাকালীন রোগযন্ত্রণায় জর্জরিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করেন কিংবা বোধশক্তিহীন রোগীর পক্ষে তাঁর আত্মীয়স্বজন চিকিৎসকের সাহায্যে অনেক সময় কষ্টহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। এই মৃত্যুকে একটি শব্দে 'স্বেচ্ছামৃত্যু' বলা যেতে পারত। কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, আত্মহত্যা বা আত্মহননও একপ্রকার 'স্বেচ্ছামৃত্যু'। সেজন্য আত্মহনন থেকে এই মৃত্যুকে পৃথক করার জন্য বলা হয় 'চিকিৎসাতীত বিনা যন্ত্রণায় রোগীর মৃত্যু সঙ্ঘটন' বা ইংরাজীতে 'ইউথেনেসিয়া'। আরো সংক্ষেপে বলা যায় 'বিনা যন্ত্রণায় চিকিৎসাতীত মৃত্যু'। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে এই মৃত্যু পদ্ধতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। দীর্ঘকাল রোগীর জ্ঞান না থাকলে এরকম মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে বিপাকে

পড়তে হয় রোগীর আত্মীয়স্বজন এবং চিকিৎসকদের। জ্ঞান থাকলে অবশ্য এ বিষয়ে রোগীর সম্মতি পাওয়া যেতে পারে, যদিও অনেক দেশে এরকম মৃত্যু-পদ্ধতি আইনানুগ নয়। আইনসম্মত হলেও চিকিৎসক এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে উপযুক্ত ওষুধের সাহায্যে যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ আধুনিক কালে এই প্রকার 'স্বেচ্ছামৃত্যু' সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং সেজন্য অনেক দেশে এই মৃত্যু এখন আইনসম্মত হয়নি।

**পালি সাহিত্যে স্বেচ্ছামৃত্যু**

পালি সাহিত্যে বিবৃত হয়েছে, চিকিৎসকের সহায়তায় চিকিৎসাতীত স্বেচ্ছামৃত্যু সম্বন্ধে বুদ্ধকর্তৃক প্রবর্তিত তৃতীয় 'পারাজিকা-ধম্মা' উল্লেখযোগ্য। 'পারাজিকা-ধম্মা' হলো কোন ভিক্ষু বিশেষ গর্হিত অপরাধ করলে, তাঁকে চীবর ত্যাগ করিয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ থেকে বিতাড়িত করা হয়। পালি 'বিনয়' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, অনেক ভিক্ষু/ভিক্ষুণীদের এই সকল অপরাধের জন্য এরকম কঠিন শাস্তি পেতে হয়। এইসব ক্ষেত্রে বুদ্ধের নির্দেশ : 'যো পন ভিক্ষু সঞ্চিচ্চ মনুসস-বিগ্গহং জীবিতা বোরো পেযয্য সত্থ হারকং বা' স পরিসেয়য্য মরণ বণ্ণং বা সংবন্নেযয্য মরণ-আয় বা সমাদপেযয্য, অম্ভো পুরিস, কিংত্যুহ' ইমিনা পাপকেন দুজ্জিবিতেন, মতং তেজীবিতা সেয়্যো তি, ইতি চিত্ত-মনো চিত্ত-সংকপ্পো অনেক পরিয়াযেন মরণবণ্ণং বা সংবণ্ণোযেযা, মরণায় বা সমাদপেযয্য, অয়ং পি পারাজিকো হোতি অসংবাসো''— যদি কোন ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির জীবন বিনাশ করেন, অথবা তাঁর জীবন নাশের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করেন অথবা প্রকাশ্যে মৃত্যুর প্রশংসা করেন, অথবা সেই ব্যক্তিকে মৃত্যু বিষয়ে উৎসাহিত করে বলতে থাকেন : 'হে সৌম্য! এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনযাপনের কি কিছু লাভ আছে? জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।' অথবা, এসকল চিন্তা এবং ভাবনা মনে পোষণ করে বিভিন্ন প্রকারে মৃত্যুর প্রশংসা করলে, বা তাঁকে এভাবে মৃত্যুর প্রতি উৎসাহিত করলে, সেই ভিক্ষু ভিক্ষুজীবনে পরাজিত হবেন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘে তার আর স্থান নেই।'[১]

দশ 'অকুশল-কম্মপথ' এবং তৃতীয়' পারাজিকা বিধি ব্যাখ্যা করে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পালি অথকথাকার বুদ্ধঘোষ মন্তব্য করেছেন, হত্যাকর্ম সংগঠিত হবে যদি ছয়টি 'পয়োগ' বা 'উপায়' সহ নিম্নোক্ত পাঁচটি 'সম্ভার' বা 'শর্ত' উপস্থিত থাকে যেমন, (ক) 'পান' বা প্রাণ' বিদ্যমান, (খ) 'পাণসঞ্ঞিতা' বা হত্যাকারীর হত্যার পূর্বে প্রাণীহত্যা বিষয়ে যেন কোন সংশয় না থাকে, (গ) 'বধক-চেতনা' বা হত্যাকারীর যেন হত্যার ইচ্ছা বর্তমান থাকে, (ঘ) 'উদকম্ম' বা হত্যাকারী যেন হত্যার বিষয়ে সচেষ্ট হয়, (ঙ) 'মরণং' বা প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ প্রকৃতপক্ষে যেন হত্যা সংগঠিত হয়। তেমনি ছয়টি 'পয়োগ' হলো : (১) 'সহতিথক' বা নিজের হাতে হত্যা করা, (২) 'আণবিক' বা হত্যার আদেশ দেওয়া,

(৩) 'নৈসসগ্গিক' বা হত্যার অভিলাষে নিক্ষিপ্ত করা, (৪) 'খাবরো' বা হত্যার জন্য লিখিতভাবে আদেশ দেওয়া, (৫) 'বিজ্জাময়ো' বা তন্ত্রসাধনার দ্বারা হত্যাকর্ম সম্পাদন, এবং (৬) 'ইদ্ধিময়ো' বা ঋদ্ধিশক্তির সাহায্যে হত্যা করা।

এই তৃতীয় 'পারাজিকা' বিধিটি অনুধাবন করলে দেখা যাবে, যে কোন পরিস্থিতিতেই চিকিৎসাতীত স্বেচ্ছামৃত্যু কাম্য নয় এবং তা কোনভাবেই অনুমোদন করা যায় না, কারণ বুদ্ধোপদেশ অনুসারে এ প্রকার মৃত্যু হত্যালীলার নামান্তর এবং এরূপ প্রাণ নাশকে এক অর্থে 'নরহত্যা' বলা যায়।

পালি সাহিত্যে দেখা যায়, একদা বুদ্ধ বৈশালীর মহাবন-এ অবস্থানকালে মানবদেহের অপবিত্রতা ও অশুচি বিষয়ে ভিক্ষু শিষ্যদের নিকট ধর্মোপদেশ দেন। অতঃপর তিনি এক পক্ষকাল নির্জনে বসবাসের মানসে সে স্থান ত্যাগ করেন। তাঁর দেশনার পর দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নত অনেক ভিক্ষুই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে লাগলেন। কিন্তু অপর একদল ভিক্ষু জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দুঃখময় পার্থিব জীবন অবসানকল্পে সেখানকার মিগলণ্ডিক নামে অবিশ্বাসী শ্রমণ (সমণকত্তক)-এর কাছে গিয়ে অস্ত্র দ্বারা তাঁদের মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে অনুরোধ জানালেন। মিগলণ্ডক তাঁদের এই অনুরোধে সাড়া দিল একথা ভেবে যে মৃত্যুর পর ভিক্ষুদের চীবর এবং ভিক্ষাপাত্রের অধিকারী সে হতে পারবে এবং ভিক্ষুরাও ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন। প্রথম দিন তরবারির সাহায্যে অনেকের মুণ্ডুচ্ছেদ করার পর বগ্গমুদা নদীতে রক্তস্নাত তরবারি ধুতে যাওয়ার সময় এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তার মনে অনুশোচনা এবং ভয়ানক ভয় হতে লাগল। নদীতীরে সে মুহূর্তে সারকায়িক দেবতা নামে এক অশুভশক্তি তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাকে উৎসাহিত করে বলল যে মিগলণ্ডিক কোন অন্যায় বা অপকর্ম করছে না, উপরন্তু সে ঐ ভিক্ষুদের আত্মহননে সাহায্য করে তাঁদের পার্থিব জীবনের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি লাভের সহায়তা করছে। এই কথা শুনে দ্বিগুণ উৎসাহে একদিনে ষাটজন পর্যন্ত ভিক্ষুর প্রাণ নাশ করতে লাগল সে। এদিকে বুদ্ধ দু'সপ্তাহ পরে নির্জনবাস থেকে ফিরে এসে দেখলেন ভিক্ষুসংখ্যা অনেক কমে গেছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন আত্মহনন হচ্ছে ভিক্ষু জীবনের চারটি চরম অপরাধের মধ্যে তৃতীয় অপরাধ এবং এই অপরাধ শাস্তির অযোগ্য।[২] এভাবে মানবজীবন বিনাশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তিনি বললেন : "যদি কোন ভিক্ষু স্বেচ্ছায় মানবজীবন ধ্বংস করেন কিংবা তাঁর প্রাণনাশের জন্য হত্যাকারীর অনুসন্ধান করেন, তবে ভিক্ষুজীবনে তিনি পরাজিত বলে ধরে নেওয়া হবে এবং সঙ্ঘ থেকে তাঁর বহিস্কার অবশ্যম্ভাবী"। বৌদ্ধ 'বিনষ্ট' অনুসারে এই 'পারাজিক' বিধি প্রবর্তনের ফলে আত্মহত্যা, এমনকি অনুরোধক্রমে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ কিংবা মৃত্যুর জন্য প্ররোচনা দেওয়া কিংবা সহায়তা করা একেবারেই নিষিদ্ধ করা হলো। এই বিধি প্রচলনের ফলে ইউথেনেসিয়া বা চিকিৎসাতীত অসুস্থ রোগীর বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণও অনৈতিক ও অকৃত্য হল।

অন্য একটি ঘটনায় দেখা যায়, একদিন জনৈক ভিক্ষু বধ্যভূমিতে যান এবং জহ্লাদকে পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকর্ম সেই মুহূর্তে সম্পন্ন করতে বলেন বন্দীর অসহ্য দুঃখকষ্টের কথা ভেবে। জহ্লাদ তাঁর কথায় বন্দীকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই হত্যা করলো। কেবলমাত্র বন্দীর অসহনীয় মানসিক চাপ এবং দৈহিক কষ্ট লাঘবের জন্যই ভিক্ষুর এই অনুরোধ। গৌতম বুদ্ধ এই ঘটনা অবগত হয়ে ঐ ভিক্ষুর 'পারাজিকা' দণ্ড অনুমোদন করেন।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণী অন্যের মৃত্যুর কারণ বিষয়ক অনেক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় পালি সাহিত্যে। ঘটনা অনুসারে প্রয়োজন মতো 'বিনয়' বিধি প্রবর্তিত হয়েছে সময়ে সময়ে। একটি ঘটনায় দেখা যায়, এক ব্যক্তি কর্তিত হস্তপদ-এর ফলে সম্পূর্ণরূপে অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। ফলে তিনি নিজের যত্ন নিজে তো নিতেই পারলেন না, পরন্তু সব সময় অপরের দয়ার উপর এমন কি খাদ্যবস্তু গ্রহণের ব্যাপারেও তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন হলো। তাঁর প্রতিবেশীরা ভাবলেন, ঐ ব্যক্তির উৎকর্ষ জীবনমানের অবনমন ঘটেছে এবং এই শোচনীয় দুঃখময় অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তার একমাত্র উপায় হচ্ছে মৃত্যুবরণ। ঠিক সে সময় ঐ ব্যক্তির গৃহে আগমন করেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু যিনি তাঁর ঐ শোচনীয় অসহায় অবস্থা দেখে তাঁকে এবং তাঁর অত্মীয়স্বজনকে সহায়তা করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে নবনীত মিশ্রিত দুগ্ধ পাণীয়স্বরূপ প্রদান করেন। সেই পানীয় পান করলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। যদিও ঐ মৃত্যুর স্বেচ্ছামৃত্যু কিনা জানা যায় না, তবে এটি যে একটি চিকিৎসাতীত অসহায় রোগীর প্রত্যক্ষভাবে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যুর ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঐ ভিক্ষু সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুর ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন এই বিষয় প্রচারিত হলে, তাঁকে সঙ্ঘ থেকে বহিস্কার করা হয়।[৩] এরকম আরেকটি ঘটনায় বিবৃত হয়েছে, জনৈক ভিক্ষুণী এক রোগীকে, লবণযুক্ত অম্লস্বাদ বিশিষ্ট জইয়ের মণ্ড খেতে বিধান দেন। সেই খাদ্য গ্রহণের অব্যবহিত পরে রোগী প্রাণ ত্যাগ করেন। এক্ষেত্রেও 'পারাজিকা' বিধি লঙ্ঘনের জন্য ঐ ভিক্ষুণী সঙ্ঘ থেকে বহিস্কৃত হন।[৪] অন্য এক ঘটনায় দেখা যায়, অসংযত একদল ভিক্ষু এক গৃহবধূর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে জীবন সম্পর্কে অনাসক্তি এবং ইহজন্ম সঞ্চিত পুণ্য রাশির ফলে পরজন্মে স্বর্গপ্রাপ্তি বিষয়ে ঐ গৃহস্থ অর্থাৎ ঐ গৃহবধূর স্বামী-কে উৎসাহিত করে তাঁকে কুখাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেন এবং ফলে ঐ গৃহস্থের মৃত্যু হয়। বুদ্ধকে ঐ ঘটনা বিবৃত করা হলে তিনি সেই ভিক্ষুদের সঙ্ঘ থেকে বহিস্কার করে তৃতীয় 'পারাজিক' বিনয় বিধি সম্প্রসারিত করে 'মৃত্যু বিষয়ে উৎসাহিত করা' বাক্যাংশটি সংযোজনের দ্বারা নিম্নোক্ত নিয়মটি বিধিবদ্ধ করলেন : 'যদি কোন ভিক্ষু ইচ্ছাকৃত ভাবে কারো জীবন নাশ করেন অথবা কোন হত্যাকারীকে নিয়োগ করেন অথবা অযথা মৃত্যু বিষয়ে প্রশংসাত্মক উক্তি করেন, অথবা কাউকে মরণে প্ররোচিত করেন অথবা কেউ সুচিন্তিতভাবে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সকল প্রকার মৃত্যু বিষয়ক প্রশংসাত্মক উক্তি করেন কিংবা যে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর জন্য প্ররোচনা দেন, সেই ভিক্ষু ভিক্ষু জীবনে পরাজিত এবং সঙ্ঘ থেকে বহিস্কৃত হবেন।[৫]

চীনা-পরিব্রাজক হিয়েন সাঙ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তীর্থ যাত্রায় ভারতে এসে জানতে পারলেন সে সময় যখন যেসব ব্যক্তি অতি বয়োবৃদ্ধ হতেন এবং বুঝতে পারতেন তাঁদের জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে ও তাঁদের মৃত্যু আসন্ন প্রায় অথবা যে সকল ব্যক্তি দূরারোগ্য ব্যাধিতে মানসিক ও দৈহিকভাবে বিপর্যস্ত ও জর্জ্জরিত, তাঁরা পার্থিব জীবনের অশুচিতা ও বন্ধন থেকে মুক্ত হতে মৃত্যুবরণ করতে সম্মতি দিতেন। সুতরাং সেই সকল ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা সঙ্গীতনৃত্যসহ আমোদ-প্রমোদ ও উপাদেয় খাদ্যবস্তুর দ্বারা আপ্যায়িত করে তাঁদের একটি নৌকায় শায়িত করে চির বিদায় জানাতেন। সেই নৌকা গঙ্গাবক্ষে বাহিত হয়ে নদীমধ্যস্থলে এলে নিমজ্জিত হয়ে নিজেরা আত্মাহূতি দেন এই আশায় যে মৃত্যুর পর তাঁদের সকলের স্বর্গলাভ হবে। হিয়েন সাঙ আরও জানতে পারলেন, এই মৃত্যু অভিলাষীদের দশজনের মধ্যে একজন ব্যক্তির পরে জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা বিষয়ে সন্দিগ্ধ হন এবং দেখা গেছে নদী তীরে অন্ততঃ একজনের মৃত্যু হয়নি। এই চীনা পরিব্রাজকের অভিমত এরকম স্বেচ্ছামৃত্যু বৌদ্ধ 'বিনয়' এবং ধর্ম অনভিপ্রেত।[৩]

গৌতম বুদ্ধ আধুনিক ইউথেনেসিয়া বা চিকিৎসাতীত বিনা যন্ত্রণায় রোগীর কিংবা যে কোন ব্যক্তির যে কোন পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছামৃত্যু অনুমোদন করেননি। কারণ তিনি যে পঞ্চশীল-এর দেশনা দিয়েছিলেন তার প্রথমটি হলো : পাণাতিপাতা বেরমণী—'প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকা'। এই বাক্যের তাৎপর্য হলো অসময়ে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে প্রাণবিনাশ থেকে বিরত থাকা। এই মূল বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনান্তে তিনি 'বিনয় পিটকান্তর্গত তৃতীয়' পারাজিক বিধি বলবৎ করে রোগীর কিংবা যে কোন ব্যক্তির অকাল এবং স্বেচ্ছামৃত্যু বন্ধ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তবুও চীনা পরিব্রাজকের ভারত পরিক্রমার সময় এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়। তা তিনি দেখেছেন ও শুনেছেন এবং এই ব্যবস্থার অপকারিতাও উল্লেখ করেছেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। বস্তুতঃ বৌদ্ধ নীতি বা শীল অনুসারে মনুষ্য জীবনের মূল্য অপরিসীম। পার্থিব জীবন সুন্দর সৎ এবং সর্বজনগ্রাহ্য করাই হলো বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য। মৃত্যুকে অতিক্রম বা জয় করাই বৌদ্ধধর্মের সার কথা, জীবনকে ধ্বংস করা নয়। এই প্রেক্ষিতে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বৌদ্ধধর্ম কখনই চিকিৎসকের সাহায্যে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু অনুমোদন করে না। চিকিৎসকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ রোগকে নির্মূল করতে তৎপর হওয়া, রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া নয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান যতোই ইউথেনেসিয়া ব্যবস্থার পক্ষে মত দিক না কেন আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিক থেকে এরকম মৃত্যু কখনই কাম্য নয়।

রোগীর চিকিৎসাতীত যন্ত্রণাহীন এই মৃত্যু ব্যবস্থার বিষয় আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র অনুমোদন করেছে, মৃত্যুপথযাত্রী রোগী রোগযন্ত্রণা থেকে এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনকে মানসিক চাপ ও দৈনিক পরিশ্রম থেকে মুক্তির বিষয় ভেবে। বর্তমান বিশ্বের অনেক চিকিৎসকই এই পদ্ধতিতে মৃত্যু সংগঠনের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নানা সামাজিক সমস্যা ও জটিলতার কথা ভেবে বিভিন্ন দেশে এই ব্যাপারে মতানৈক্য

রয়েছে। অনেক চিকিৎসক মনে করেন, ইউথেনেসিয়া পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অনৈতিক। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন শারীরিক যন্ত্রণা ও কষ্ট আধুনিক ওষুধের সাহায্যে উপশম করা যেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় উন্নতির ফলে যে কোন দূরারোগ্য ব্যাধি একেবারে নিরাময় না হলেও ব্যাধির প্রকোপ কিছুটা কমান যায়। কিন্তু আরেকদল চিকিৎসক মনে করেন ক্যান্সার, এইড্‌স, জটিল স্নায়ুপীড়ার ন্যায় দূরারোগ্য ব্যাধিজনিত কষ্ট কোন ব্যক্তির পক্ষে দীর্ঘকাল সহ্যাতীত এবং তাঁর নিকট আত্মীয়স্বজনের পক্ষেও দীর্ঘকাল ধরে হাসপাতাল ও ওষুধের ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে রোগী এবং তাঁর নিকট আত্মীয়ের সম্মতি নিয়ে চিকিৎসাতীত যন্ত্রণাহীন মৃত্যুপদ্ধতির সাহায্য অবলম্বন করা যাবে।

বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলিতে চিকিৎসকের সহায়তায় এরকম মৃত্যু ব্যবস্থা আইনানুগ। একমাত্র হল্যাণ্ডেই প্রত্যেক বছর চিকিৎসক অনুমোদিত এই মৃত্যু ব্যবস্থায় ২০০০ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেন। এই তিনটি দেশেই রোগী থেকে ক্রমাগত অনুরোধ আসে আইনসঙ্গত এই মৃত্যু পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য। জার্মানীতেও অধিকাংশ নাগরিক চান মৃত্যু পথযাত্রী রোগীকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্যু বরণ করতে দেওয়া হোক। কিন্তু সে দেশের সরকার এর স্বপক্ষে এখনও কোন আইন প্রণয়ন করেননি। সেরকমই ইংল্যাণ্ড, ইতালি, পোল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে চিকিৎসাতীত রোগীদের যন্ত্রণাহীন স্বেচ্ছামৃত্যু আইনসম্মত নয়। একই পরিস্থিতিতে এই মৃত্যু ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশে এখনো আইনের অনুমোদন লাভ করেনি। এই সকল দেশে এভাবে মৃত্যু যদিও প্রচুর জনসমর্থন লাভ করেছে। তবুও এখনও পর্যন্ত তা আইনসিদ্ধ হতে পারেনি। কিন্তু কোন চিকিৎসক, ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান মুমূর্ষু বোধশক্তিহীন কিংবা চলনশক্তিহীন কোন রোগীর আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রানুযায়ী এ প্রকার যন্ত্রণামুক্ত মৃত্যু ঘটান তবে তাঁর কিংবা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের এবং চিকিৎসকদের অর্থদণ্ড, কারাবাস ইত্যাদির মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রাপ্য।[৩] উল্লেখ্য, সম্প্রতি ব্রিটেনের একটি টি.ভি. চ্যানেল ঠিক করেছে ইউথেনেসিয়া বা ইউথানাসিয়া বা চিকিৎসাতীত স্বেচ্ছায়মৃত্যু বা সুখমৃত্যু নিয়ে একটি তথ্যচিত্র দেখাবে। ফলে সমগ্র ব্রিটেনে শুরু হয়ে গিয়েছে এক চরম বিতর্ক যার কারণে ব্রিটেনের নাগরিকেরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। একদল স্বেচ্ছামৃত্যুর বিরুদ্ধে, আরেক দল স্বেচ্ছামৃত্যুর পক্ষে। বিতর্কিত তথ্য চিত্রটিতে রয়েছে সুইজারল্যাণ্ডের একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এক ভদ্রলোক যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি পেতে তাঁর স্ত্রীর সামনে আত্মহত্যা করছেন। সেই ভদ্রলোকের জীবনের শেষ কয়েক মিনিট দেখানো হয়েছে তথ্য চিত্রটিতে। স্বেচ্ছামৃত্যু এবং আত্মহত্যাকে সমর্থন করার জন্য সেই তথ্যচিত্রের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত একদল ব্রিটিশ নাগরিক। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, ব্রিটেনের শিক্ষিতদের মাথায় এই ধরনের চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে সিদ্ধান্তরূপে আত্মহত্যা এবং স্বেচ্ছামৃত্যুকে মেনে নেওয়া।[৪] ব্রিটেনে এই বিতর্ক এতটাই

তীব্র হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন : "আমার মনে হয়েছে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির নিজস্ব বিবেকের ব্যাপার। আর সে কারণে সংসদ পরিষ্কারভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশে যাঁরা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং যাঁরা বার্ধক্যের কারণে স্থবির হয়ে গিয়েছেন তাঁরা যেন কখনও মনে না করেন যে তাঁদের মৃত্যু যাতে ত্বরান্বিত হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের উপর কোনও ধরনের মানসিক চাপের বিরুদ্ধে আমি। আর সে কারণে আমি সব সময়েই ইউথেনিসিয়া সম্পর্কিত কোন আইন তৈরীর বিরুদ্ধে"।

স্বেচ্ছামৃত্যুর পরিস্থিতি বিভিন্ন দেশে ইউথেনেসিয়া বা চিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসাতীত রোগীর স্বেচ্ছামৃত্যুর আইনানুগ পরিস্থিতি নিম্নরূপ :

| দেশ | ইউথেনেসিয়া বা চিকিৎসকের সহায়তায় আত্মহননের বর্তমান অবস্থা |
|---|---|
| ১। অস্ট্রেলিয়া | : স্বেচ্ছামৃত্যু আইনসম্মত নয়, উত্তরাঞ্চলে আইনসম্মত হয় ১৯৯৫ সালে যদিও ১৯৯৭ সালে আইনটি বাতিল করা হয়। |
| ২। বেলজিয়াম | : ২০০২ সাল থেকে ইউথেনেসিয়া আইনসম্মত হয়। |
| ৩। কানাডা | : ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ নয়। |
| ৪। কলম্বিয়া | : ইউথেনেসিয়ার অবস্থিতি স্পষ্ট নয়। সাংবিধানিক আদালত ১৯৯৭ সালে অনুমোদন করেন, কিন্তু কংগ্রেস কখনো তা বলবৎ করেননি। |
| ৫। জার্মানী | : ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ নয়। |
| ৬। ভারত | : ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ নয়। |
| ৭। ইজরায়েল | : ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ নয়। |
| ৮। ইতালি | : ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ নয়। |
| ৯। জাপান | : ইউথেনেসিয়ার অবস্থিতি স্পষ্ট নয়। জাপানের ফৌজদারি আইন অনুসারে স্বেচ্ছামৃত্যু বৈধ নয়। কিন্তু ১৯৬২ সালে সেখানকার 'নাগোয়া হাইকোর্ট আদেশ ১৯৬২' অনুসারে ছয়টি সুনির্দ্দিষ্ট কারণে যে কোন রোগী তাঁর জীবনের ইতি টানতে পারেন। |
| ১০। নেদারল্যাণ্ডস | : ২০০১ সাল থেকে ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ। |
| ১১। রাশিয়া | : ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ নয়। |
| ১২। স্পেন | : ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ নয়। |
| ১৩। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য | : ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ নয়। |
| ১৪। বাংলাদেশ | : ইউথেনেসিয়া আইনসিদ্ধ নয়। |

**মন্তব্য**

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বেচ্ছামৃত্যু বা ইউথেনেসিয়া-র অধিকার ইউরোপের কয়েকটি দেশে স্বীকৃত হলেও ব্রিটেনে এই অধিকার এখনো অবৈধ। তবে সাম্প্রতিককালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব জীবন শেষ করার বিষয়ে ব্রিটেনে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে।[৬] দেখা যায়, ইউথেনেসিয়া বা চিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসাতীত যন্ত্রণাকাতর ব্যক্তির স্বেচ্ছামৃত্যু বা সুখমৃত্যু বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন মত রয়েছে। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মেও এপ্রকার মৃত্যু স্বীকৃত নয়। কারণ পঞ্চশীল-এর প্রথম শীলটি এর দ্বারা খণ্ডিত হবে। সুতরাং যন্ত্রণাকাতর রোগীদের সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে না পারলেও তাঁদের ব্যাধির কষ্ট কিছুটা অন্ততঃ লাঘব করতে চিকিৎসকবৃন্দ সচেষ্ট হবেন। এই আশা করা যেতেই পারে।

**পাঠসংকেত**


১। 'বিনয়-পিটক', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৩, 'পাতিমোক্‌খ', পৃঃ ৯।

২। 'বিনয়-পিটক', ৩য় খণ্ড, পালি টেক্সট সোসাইটি, পৃঃ ৬৮, 'সমন্তপাসদিকা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯।

৩। Keown, Damien, *Buddhism Bioethics*. Macmilan, 1995, pp. 168-173.

৪। 'বিনয়-পিটক', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮, পৃঃ ৮৫।

৫। Beal, Samuel tr. *SI-YU-KI : Buddhist Records of the Western World.* Delhi, Oriental Books Reprint Corpn, 1969, Vol. I, pp. 86-87, Watters, Thomas *tr. On Yuan Chwang's Travels in India : A.D. 629-645*. Delhi, Munshi Ram Manohar Lal, 1961, Vol. I, pp. 174-175.

৬। 'জগজ্জ্যোতি ২০০৮', কোলকাতা, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ২০০৮, পৃঃ ৯১-৯৩ (Barua, Ankur, *Buddhist Bio-Ethics related to Euthanasia Practice).*

৭। 'দৈনিক স্টেটসম্যান', কোলকাতা, তারিখ ১২ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১১।

পঞ্চম অধ্যায়

# পরিশেষ

গৌতম বুদ্ধের উপদেশাবলীর সাহায্যে বর্তমান সময়ে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ এবং সেগুলির প্রতিবিধানের জন্য গবেষকবৃন্দ নিরবচ্ছিন্ন নিরত রয়েছেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ করতে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিভিন্ন শব্দবন্ধের প্রচলন করেন। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অধুনা অধিকাংশ গবেষকই সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে কর্মে উৎসাহ ও গতি সঞ্চার করতে কিংবা বৌদ্ধবিহারে সমবায় সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে বুদ্ধ-ভক্তদের আগ্রহী করে তুলতে Socially Engaged Buddhism বা 'সামাজিক কর্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা সামাজিক কর্ম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বৌদ্ধধর্ম' অথবা সংক্ষেপে Engaged Buddhism বা 'কর্মপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ' বা 'কর্মপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম', কিংবা বিশেষ কোন অঞ্চলের বা সমগ্র বিশ্বের পরিবেশ সুরক্ষায় Green Buddhism বা 'হরিৎ বৌদ্ধধর্ম' ইত্যাদি শব্দবন্ধ প্রচলন করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রসঙ্গে এরকম ভিন্ন ভিন্ন শব্দবন্ধের পরিবর্তে বৌদ্ধধর্মের সর্ব প্রকার ব্যবহারিক বা ফলিত প্রয়োগ বিবেচনা করে ২০০৫ সালে কেবলমাত্র একটি শব্দবন্ধ Applied Buddhism বা 'ফলিত বা প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম'-এর প্রবর্তন করা হয় প্রথমবার (দ্রষ্টব্য) Applied Buddhism : Studies in the Gospel of Buddha from Modern Perspectives, by Dipak Kumar Barua, Centre For Buddhist Studies, Banaras Hindu University, Varanasi, 2005). এই নব প্রবর্তিত শব্দবন্ধটি অর্থাৎ 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম'-এর দ্বারা প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম-এর বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক প্রকাশ করা সম্ভব। শব্দবন্ধটি এক বিশাল ছত্রসদৃশ, এই ছত্রছায়ায় অবস্থান বিভিন্ন ব্যবহারিক শব্দবন্ধ-এর। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যে সকল উপায় গৌতম বুদ্ধের ধর্মদেশনায় লভ্য, সেগুলিকে একত্র করে সামগ্রিকভাবে তাকে 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজনৈতিক তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক বিপর্যয় চরম আকার ধারণ করেছে। ফলস্বরূপ মানব জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিনাশ আসন্ন। যেহেতু সময় এবং স্থান সীমিত, সেহেতু প্রতীকিরূপে তিনটি বিষয় নির্বাচন করে সেগুলির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে বর্তমান বক্তব্যে। মানব হিতার্থে কেবল তিনটি বিষয় মনোনীত করা হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে জনগণ 'সুশাসন'-এর প্রকৃত স্বরূপ বিস্তৃত হতে বসেছেন। 'সুশাসন'-এর পরিবর্তে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এখন 'অরাজকতা' এবং সন্ত্রাস-এর আবির্ভাব ঘটেছে। তাই সর্বপ্রথমে 'সুশাসন' এর সংজ্ঞা নির্দেশ করে এ বিষয়ে বুদ্ধোপদেশের প্রয়োগ নির্ণীত করার প্রয়াস করা

হয়েছে। অবাক হতে হয়, 'খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েও গৌতম বুদ্ধ একবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের ন্যায় শাসনকর্তার প্রকৃত কর্তব্যকর্ম নির্দেশ করে যথার্থ অর্থে 'সুশাসন'-এর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার আয়াস করেছেন। এই বক্তব্যে 'সুসাশন' নামক একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হল, জনগণের কল্যাণ সাধন। প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ বা কল্যাণকর অর্থনীতি এবং বৌদ্ধ অর্থনীতি সমার্থবহ। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব সম্পদ এর যথাযোগ্য ব্যবহারের ফলে পার্থিব জীবন মঙ্গলময় সুখকর করা যায়। বুদ্ধ তথাকথিত অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন না। এতৎসত্ত্বেও একজন দক্ষ অর্থনীতিবিশারদ-এর ন্যায় তিনি মানব কল্যাণের জন্য কয়েকটি পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। তৃতীয় যে বিষয়টি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে সেটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী করে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে 'স্বেচ্ছামৃত্যু' কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এটি একটি প্রাণ হত্যারই নামান্তর। চিকিৎসকের সহায়তায় চিকিৎসাতীত মৃত্যু 'হত্যা' ছাড়া অন্য কিছু নয়। পুনরায় অন্যথায় চিকিৎসাতীত রোগীর এরূপ মৃত্যু 'আত্মহত্যা' ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সুতরাং সচেতনভাবে প্রাণ বিনষ্ট বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারে সর্বপ্রকারে ত্যাজ্য। এভাবে বৌদ্ধধর্ম-এর প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলি থেকে থেকে সাময়িক এবং সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনা করে শুধুমাত্র সুশাসন, কল্যাণ বা মঙ্গলময় অর্থনীতি এবং স্বেচ্ছামৃত্যু নির্বাচন করা হয়েছে। বস্তুত বুদ্ধের ধর্মোপদেশের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ক আলোচনা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘায়িত করা গেলেও বিভিন্ন কারণে এই আলোচনা সমাপ্ত করা প্রয়োজন। আধুনিক পরিস্থিতিতে বুদ্ধের অমূল্য বাণীসমূহ প্রয়োগের ফলেই 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম'-এর উৎপত্তি এবং জনপ্রিয়তা।

# নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী


**আকরগ্রন্থ**

'জাতক', ৬ খণ্ড, বঙ্গানুবাদ ঈষাণ চন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

'দীঘ-নিকায়', ৩ খণ্ড, বঙ্গানুবাদ ভিক্ষু শীলভদ্র। কলিকাতা, মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৫৩-১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

'ধম্মপদ : মূল ও বঙ্গানুবাদ', সম্পা. ও অনু. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। কলিকাতা, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১৯৫৪।

'ধম্মপদ-অট্ঠকথা : বৌদ্ধ গল্প-যমক বর্গ, ১ম খণ্ড, অনু. শীলালঙ্কার মহাস্থবির। কলিকাতা, মহাবোধি সোসাইটি।

'মহাপরিনির্বাণের কথা', বঙ্গানুবাদ সুকুমার দত্ত, দিল্লী, পাবলিকেশানস ডিভিশান, সিনিষ্ট্রি অফ ইনফরমেশান এ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং, গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়া, ১৯৬০।

'মহাবগ্গ : বিনয় পিটক', ১ম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির। কলিকাতা, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড, ১৯৩৭।

'মধ্যম-নিকায় : মূল পঞ্ঞাস সুত্ত', বঙ্গানুবাদ বেণীমাধব বড়ুয়া। কলিকাতা, যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড, ১৯৪০।

'মধ্যম নিকায় : দ্বিতীয় ভাগ', বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। কলিকাতা, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, ১৯৫৬।

'মধ্যম নিকায় : তৃতীয় খণ্ড উপরি পঞ্চাশ সূত্র, বঙ্গানুবাদ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, কলিকাতা, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৩।

'মিলিন্দ প্রশ্ন', বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, কলিকাতা, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৭৭।

**সহায়ক গ্রন্থ**

Barua, Dipak Kumar. *Applied Buddhism : Studies in the Gospal of Buddha From Modern Perspectives.* Varanasi, Centre for Buddhist Studies, Department of Pali and Buddhist Studies, Banaras Hindu University, 2005.

Barua, Dipak Kumar. *An Analytical Study of Four Nikayas.* Calcutta, Rabindra Bharati University, 1971; 2nd Edition New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 2003.

বড়ুয়া দীপক কুমার। 'আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতার প্রেক্ষিতে ফলিত বৌদ্ধধর্ম'। চট্টগ্রাম, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ২০০৯।

বড়ুয়া দীপক কুমার। 'বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শন'। কোলকাতা, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ২০০৮।

বড়ুয়া, বেণীমাধব। 'বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ : পিটক গ্রন্থাবলী : ১ম খণ্ড, পার্ট ১। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৩৬।

International Buddhist Brotherhood Association of India. *Applied Buddhism : Perspectives of Prospects : XXXII* International Buddhist Conference 2007. Bodh-Gaya, Indosan Nipponji (Japanese Temple), 2008.

Keown, Damien, *Buddhism & Bio-ethics*. London, Maesnilan, 1995.

Pearce, *J. Small is Still Beautiful* London, Harper Collins Publishers, 2001.

Schumacher, E.F. *Small is Beautiful : Economics as if people Mattered.* London, Blond & Briggs, 1973.

**পত্র-পত্রিকা**

'জগজ্জ্যোতি', বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কোলকাতা।

'জার্নাল অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ পালি', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

'নালন্দা' : নালন্দা বিদ্যাভবনের মুখপত্র, কলিকাতা।

*Journal of Buddhist Cultural Studies (Bulgyo Munhwa Yeongi),* Vol. 10, Seol, South Korea, Institute For Buddhist Culture & Social Affairs, Dongguk University, December 2009.

# ড. দীপক কুমার বড়ুয়া এক সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

পৃথিবীতে এমন কিছু ক্ষণজন্মা ও বিদগ্ধজন আছেন যাঁরা আপন গতিপথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন না। ড. দীপক কুমার বড়ুয়া তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

ড. দীপক কুমার বড়ুয়া ১৯৩৮ সালে ১৪ই এপ্রিল অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের হাসিম পুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রবীন্দ্রলাল বড়ুয়া মাতা নিরুপমা দেবী। কর্মসূত্রের তাঁর পিতা কোলকাতায় অবস্থান করতেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাঁর মা সন্তানকে নিয়ে আসেন কোলকাতায়। কোলকাতায় কে.জি স্কুলে পড়াশুনোর গোড়াপত্তন হয়। বউবাজার হাইস্কুল থেকে ১৯৫৪ সালে কৃতিত্বের সহিত মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৫৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন (ইন্টারমিডিয়েট)। ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে পালিতে বি.এ. অনার্স পাশ করেন। ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৬২ সালে লাইব্রেরী সায়েন্স পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা লাভ করেন ও স্বর্ণপদকসহ পি.আর.এস সম্মান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাউন্ট গোল্ড মেডেল লাভ করেন। ১৯৬১-৬২ সালে গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "An Anlytical Studies of Four Nikayas"। কীর্তিমান জীবনের অধিকারী ড. দীপক কুমার বড়ুয়া প্রথম কর্মময় জীবন শুরু করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লাইব্রেরী এবং ইউনেসকো ইনফরমেশন সেন্টারের দায়িত্ব ছাড়াও দর্শন ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে স্থায়ী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি রিডার এবং ১৯৭৯ সালে পালি বিভাগে ফুলটাইম প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে কলা অনুষদের ডিন (অধ্যক্ষ) নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে নব নালন্দা মহাবিহারের ডাইরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। ২০০১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মাইনরিটি কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন।

ড. বড়ুয়ার সুনাম ও কৃতিত্ব দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাঁকে ২০০২-২০০৩ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পালি ও বুড্ডিষ্ট স্টাডিজের ভিজিটিং অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য। তিনি একাডেমী কমপারেটিভ রিলিজিয়ন অব ইণ্ডিয়ার জীবন সদস্য। ২০০৩ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হন। মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার জীবন সদস্য ও লণ্ডন পালি টেক্সট সোসাইটির ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রিপাবলিক অব কোরিয়ার এশিয়া

ইনফরমেশন লাইব্রেরী এণ্ড সোসাইটির এডভাইজার এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্য। তিনি ইণ্ডো-ইরানিকা কোয়ার্টার্লি অর্গেন অব দি ইরান সোসাইটির রেসিডেন্ট এডিটর এবং বুদ্ধগয়া ইন্টার ন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সভাপতিও ছিলেন বহুদিন। তাঁর গবেষণা কর্মের অবদানও কম নয়। এযাবৎ বাংলা-ইংরেজী মিলে তাঁর ২০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

১। Anagarika Dharmapala : A study, 1964.

২। Exhibition on Folklore Catalogue : Exhibition of Books and offer Materials of folklore and Allied Subjects এই গ্রন্থটি যৌথভাবে সম্পাদন করেন ড. বড়ুয়া ও শঙ্কর সেন মহাশয়, 1966.

৩। V. iharas in Ancient India : Survey of Buddhist Monasteries, 1969.

৪। Edited : Jogajjyoti A Buddha Jayanti Annual Sovinour, 1970.

৫। An Analytical Study of Four Nikayas, 1971.

৬। Buddha Gaya temples its History, 1975.

৭। Buddhist Art of Central Asia., 1981.

৮। Ruparupa Vibhaga of Achariya Buddhadatta Thera : Pali Text with English translation and notes, edited and translated into English, 1995.

৯। BuddhaduttaKrita Ruparupa vibhaga : Mul Pali Grantha Banganubad O Nirvacita Sabda-Tika Saha, edited and Translated in to Bengali, 1997.

১০। Applied Buddhism Studies in the Gospal of Buddha from modern perspectives, 2005.

১১। Academic library System : Master of Library and information science (MLIS), 2006.

১২। Buddha Dharma O Darsan, 2008.

১৩। Adhunikata O Uttaradhunikatar Preksite phalita Buddha Dharma, 2009.

১৪। New Vajrayana Mystic Songs From Nepal : A study on the Nava Caryapada with texts and translations, 2010

১৫। Self Cultivation without self : In Perspective of Applied Buddhism, along with Ankur Barua, 2010.